তেরশো একাশি

শারদীয় গল্প সংখ্যা

কশানু

রত্নেশ্বর বর্মণ

প্রভাসকান্তি ভদ্র

জ্যোৎস্নাময় বসু

কানাই ঘোষ

প্রবীর সাহা

মদন দাশ

প্রশান্ত রায়

কিরণ মৈত্র

সরসী সরকার

দীনেশচন্দ্র সিংহ

FOR CONSTRUCTION WORK
SURELY YOU CAN TRUST US

K. B. ENGINEERS

PURNEA ● FARAKKA ● BARHARWA

সময়মতো ট্র্যাকটর পেতে হলে আগে থেকেই আপনার

এইচ এম টি

ভোটর

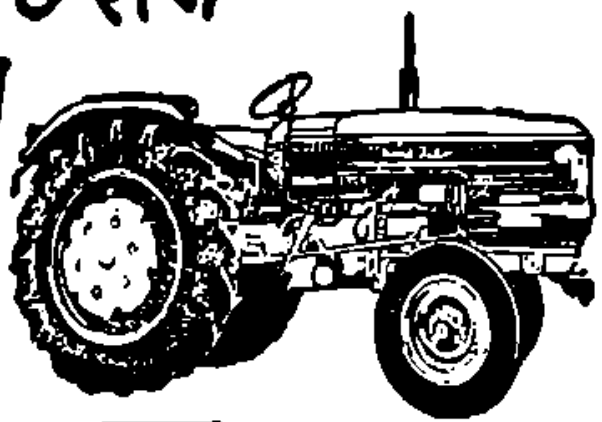

ট্র্যাকটরের জন্য বায়না করুন

ভারত সরকারের ট্র্যাকটর কন্ট্রোল আদেশ অনুসারে এখন আগে থেকেই আপনার ট্র্যাকটরের জন্যে বায়না করতে হবে। এর জন্যে আপনাকে ভারতের সঞ্চয় ব্যাংকে পাশবই মাধ্যমে ১০০০ টাকা জমা রেখে ওই পাশ বই ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাগ্রো ইণ্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশনের নামে লিখে দিতে হবে। এইভাবে যাঁরা জানুয়ারী-জুনের মধ্যে বায়না দেবেন, তাঁরা জুলাই-ডিসেম্বরের মধ্যে ট্র্যাকটর পাবেন এবং জুলাই-ডিসেম্বরের মধ্যে বায়না দিলে ট্র্যাকটর পাবেন জানুয়ারী-জুনের মধ্যে।

বায়নার ক্রমিক সংখ্যা অনুসারে ট্র্যাকটর দেওয়া হবে। পুরো দাম মিটিয়ে ট্র্যাকটর নেবার সময় ওই পাশ বই ফেরত দেওয়া হবে।

ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাগ্রো-ইণ্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন লিমিটেড (একটি সরকারী সংস্থা)

১৩-বি, নেতাজী সুভাষ রোড (চতুর্থ তল) কলিকাতা-৭০০০০১ ফোন : ২২-২৩১৪ গ্রাম : AGRINPUT

ওয়েস্ট বেঙ্গল

PILE FOUNDATION CONSTRUCTIONS COMPANY

CIVIL ENGINEERS
CONSULTANTS
CONTRACTORS

30, CHITTARANJAN AVENUE
CALCUTTA-12
Branch : PORT BLAIR

Specialists in :-

RCC Pile, Machine Foundations Etc.

PHONES : 23-3850 23-0006

With Compliments from :—

Dock office 45-6196,
Residence 24-0828

UNIVERSAL CARRIERS

TRANSPORT & LABOUR CONTRACTOR

Head office
11, British Indian Street
Calcutta-1

Dock office
17A, Watgonj Street
Calcutta-23

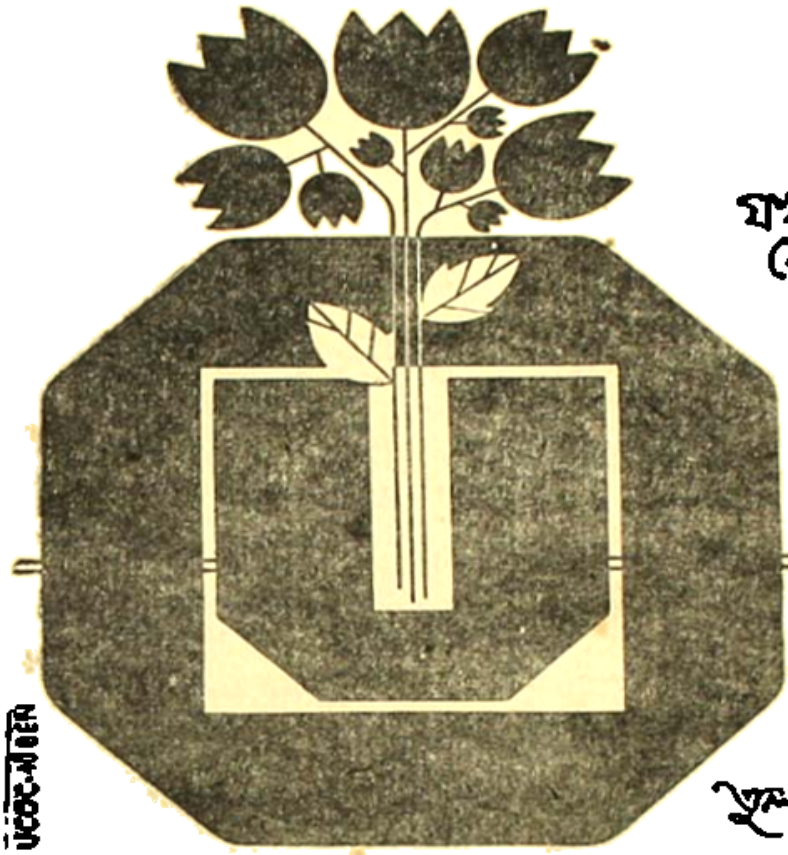

যখন আর
যেখানেই থাকুন—
উৎসবে
আর আনন্দে
আপনাদের
সঙ্গে
ইউকো ব্যাঙ্ক॥

ইউনাইটেড
কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক
জনগণকে
স্বাবলম্বী করে
তুলতে সাহায্য করছে॥

আসুন বিষ্ণুপুরে
পোড়ামাটির অপরূপ ভাস্কর্যের দেশে

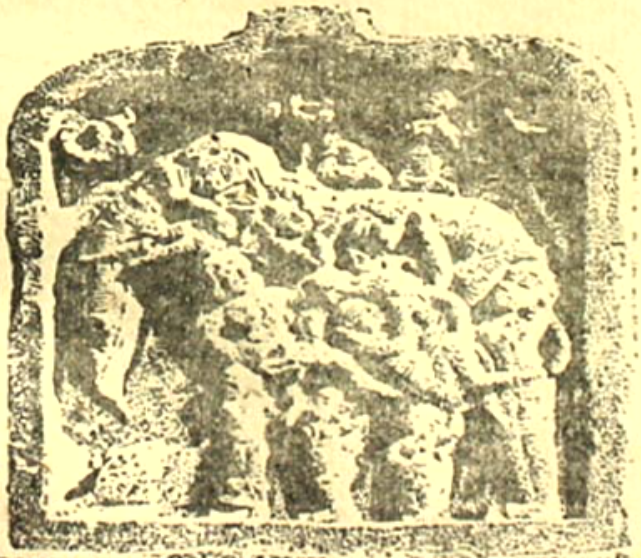

মল্লরাজা বীর হম্বীরের আমলে ও পরবর্তী সময়ে প্রতিষ্ঠিত মন্দির এবং তার অপরূপ পোড়ামাটির অলংকরণ বহন করছে বাংলার স্থাপত্যের সুমহান ঐতিহ্য।
রেল কিংবা সড়ক পথে বিষ্ণুপুরে যাওয়া যায়। জয়রামবাটী এবং কামারপুকুর থেকে বিষ্ণুপুরের দূরত্ব প্রায় ৪৫ কিলোমিটার।
সুনিশ্চিত স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য মনোরম বিষ্ণুপুর ট্যুরিস্ট লজে উঠুন।

বিবরণীর জন্য খোঁজ নিন :
ট্যুরিস্ট ব্যুরো
৩/২, বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ
(ডালহৌসি স্কোয়ার) ঈস্ট কলিকাতা-১
ফোন : ২৩-৮২৭১ গ্রাম : TRAVELTIPS
স্বরাষ্ট্র (পর্যটন) বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

TCP/TB 200 A3

With best wishes from :—

ACCUREX ENGINEERS

4, COMMERCIAL BUILDINGS.
N. S. ROAD, CALCUTTA 1.

Works COSSIPORE, CALCUTTA 2.

Telephones :—22-5293, 22-9444 } Office. 56-4026 Works, 22-2072 Residence

Makers of :—

All types of spares & tools & special equipment to customers drawing & conveyor chains & belt fasteners.

With best complimints of

Phone 22-4593

EMCO RUBBER INDUSTRIES

Head Office & Works :

GHOSAL CHACK. BELKULAI,

HOWRAH.

কৃশানু

ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা

সপ্তম বর্ষ। প্রথম সংখ্যা। শ্রাবণ—আশ্বিন। ১৩৮১

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় রত্নেশ্বর বর্মণ। ফুল-ছাপ দেওয়া বুশ সার্ট। ১॥ প্রভাসকান্তি ভদ্র। সূর্যবিন্দু। ১১॥ জ্যোৎস্নাময় বসু। হারিয়ে গেল। ১৯॥ কানাই ঘোষ। দর্পণে স্বপ্নের ছবি এবং যন্ত্রণা। ২৫॥ প্রবীর সাহা। অসংলগ্ন রাগিনী। ৩৪॥ মদন দাশ। বিষণ্ণ প্রহরী। ৪৬॥ প্রশান্ত রায়। সেই নক্ষত্রের কাছে। ৫৭॥ কিরণচন্দ্র মৈত্র। মলিনা মলিন নয়। ৬৫॥ সরসী সরকার। প্রেম। ৭৩॥ দীনেশচন্দ্র সিংহ। যে ফুল না ফুটিতে। ৭৫॥

P 29400

সম্পাদক

দীনেশচন্দ্র সিংহ

সম্পাদকী

বর্তমান শারদীয় সংখ্যা থেকে ত্রৈমাসিক কৃশানু'র সপ্তম বর্ষে সগর্ব পদার্পণ। এটা অনেকটাই টিঁকে থাকার গর্ব; আশানুরূপ ক্রমবিকাশ ও ক্রমোন্নতির গর্ব করতে পারছি না বলে আমরা নিজেরাই দুঃখিত। কারণ অবশ্য কারো অজানা নয়। নীরোগ ব্যক্তির খাদ্য থেকে রোগীর ঔষধ পথ্য পর্যন্ত যে অকারণ অযৌক্তিক মূল্য বৃদ্ধির ফাঁসে দেশের জনজীবন বিপর্যস্ত, কালী কাগজ প্রভৃতি মুদ্রণ শিল্প সম্পর্কীয় দ্রব্যও তার কবল থেকে রক্ষা পায়নি। সুতরাং কালকেতুর মতো দিনে দিনে না বেড়ে শুধু কৃশানু নয়, এ জাতীয় ক্ষুদ্র পত্র-পত্রিকাগুলি ক্রমঃক্ষীয়মান; কেহ বা বিলীয়মান। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে অনেকেই ক্ষুদ্র পত্রিকা মারফৎ সাহিত্য সাধনার পথ থেকে শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে সরে এসেছেন। আমরাও আর কতদিন হাল ধরে রাখতে পারব জানি না; তবু কৃশানুকে বাঁচিয়ে রাখতে যারা নানাভাবে আনুকূল্য করেছেন সে সব নিঃস্বার্থ শুভার্থীদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও শারদীয় শুভেচ্ছা জানাই। বলা বাহুল্য, বরাবরের মতো এবারেও গল্প সংখ্যারূপে প্রকাশিত হয়ে শারদীয় কৃশানু তার ঐতিহ্যই বজায় রাখল।

ফুল-ছাপ দেওয়া বুশ শার্ট

রত্নেশ্বর বর্মণ

আমি একটা নদী দেখেছিলাম নদীটার স্বচ্ছ নীল জল শুধু নিচের দিকে গড়িয়ে বয়ে চলে। আচ্ছা, নদীতো বটে, সুতরাং স্বিকৃত সত্যটা এই যে, নদীটা সমুদ্রে গিয়ে মিশবে। আমার ভালো লেগেছিল নদীটা। তার ছায়া স্নিগ্ধ নিবিড় বনজ শীতলতা।

একটা নদী নিয়ে এত কথা লেখার মানে, আমার জীবনটা সে শীর্ণকায়া নদীর মতো কুলকুল ভাবে গড়িয়ে চলছিল। তাতে না ছিল জোয়ারের প্লাবন, না ছিল দুকূলপ্লাবী উচ্ছলতা। নিঃশব্দে গড়িয়ে চলেছে অবধারিত মোহনার দিকে। এখন মাঝে মাঝে এমনি ভাবি, সবার যাত্রাপথই-ত একই বিন্দু লক্ষ্য করে।

যে ঘরখানাতে আমি থাকি সেখানা বেশ পরিপাটী সাজান-গোছান। ঘরে কোথায় কি আছে তা আমি চোখ বুঁজে বলে দিতে পারি। যেমন—ঘরে ঢুকেই সামনের দেওয়ালে রবি ঠাকুরের একটা ছবি। সে-ছবির নীচে বই-এর আলমারি। বাম দিকের দেওয়ালে বিবেকানন্দের ছবি। তার নীচে আমার পড়ার টেবিল, বিরাট, মেহগিনি কাঠের। কোন রাজা মহারাজার ছিল হয়তো। আমি অকশান থেকে চড়া দরে কিনে এনেছি। টেবিলের ওপরে দামী কাপড়ের ঢাকনা। তার ওপর গুটি কতক বই। সাধারণত কবিতার, আধুনিক কবিদের। ডান দিকের দেওয়ালে একটা হরিণের স্কেচ, আমার এক বন্ধু এঁকে দিয়েছে। এই ছবিটার ওপর আমার খানিকটা দুর্বলতা আছে। মনে হয়, ছবির মধ্যে একটা জীবন্ত হরিণকে আটকে রেখেছি। হরিণের ছবিটার নীচে ঝোলান এক ফরাসী কোম্পানীর ক্যালেণ্ডার, চকচকে আর্ট পেপারে ছাপা, একটা ফুলের টবের মধ্যে নাম না জানা কোন এক ফুলের ছবি। ঘরের লাল রংয়ের মেজে এতো চকচকে যে তাতে দেহের প্রতিবিম্ব ধরা পড়ে।

এই ঘরখানায় আমার দিবারাত্রির অনেক সময় কাটে। বাইরের আড্ডায় আড্ডাগুলো কমতে কমতে প্রায় শূন্যে এসে দাঁড়িয়েছে। আমার জীবনটাও

ঠাসবুনন, শৃঙ্খলার স্ব-আরোপিত শৃঙ্খলে আঁটোসাঁটো। এলোমেলো-আগোছালো হওয়ার অবকাশ বড়ো কম। তাছাড়া, একটা বয়সের পর আর নতুন বন্ধু জোটে না। সুতরাং আমি একটা বৃত্তের মধ্যে দিয়ে চলেছি। পুরাতন বন্ধুরা অবশ্য বলে—তুমি. দারুণ ম্যাকানাইজড্। তাদের অমন অভিযোগের জন্য আমি নৈরাশ্য বোধ করি না, বরং গর্ব বোধ করি। কেননা আমি বিশ্বাস করি, মানুষের এমনি ভাবেই চলা উচিত।

দৈনিক যখন আমার ঘুম ভাঙে তখন বেশ বেলা। সকালের কচি রোদ্দুর ভানপিটে ছেলের মতো গাঢ় সবুজ পর্দার ফাঁক দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ে। কার্নিসে কর্কশ স্বরে কাক ডাকে। আমি উঠি, হাই তুলি। ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে সামনের পার্কের দিকে তাকিয়ে থাকি, দাঁত মাজি। বাথরুমে যাই, মুখ ধুই, বৈদ্যুতিক যন্ত্রে দাড়ি কামাই। পাকা আধ-ঘণ্টা শাওয়ার ছেড়ে স্নান করি। অফিসের পোষাক পরি, নিচের থেকে বোন চা পাঠায়। এমন সময়ে কোম্পানীর গাড়ি পার্কের ধারে এসে হর্ণ বাজায়।

অফিস থেকে ফিরতে সন্ধে গড়িয়ে যায়। কাজ বেশী থাকলে রাতও হয়ে যায়। ঘরে ফিরি, ঢিলে পাজামা পরে ব্যালকনিতে বসে, আকাশ-চাঁদ-তারা-গাছগাছালি দেখি। ঘরের ফুলদানি রজনীগন্ধার গন্ধ ছড়ায় নিয়মিত। সামনের রাস্তা দিয়ে একটা বাচ্চা ছেলে হেঁকে যায়—বেল ফু উ-ল।

ঠিক দশটা বাজলে খাওয়ার ডাক আসে। নীচে নেমে যাই। সিঁড়ি থেকে নেমেই খাওয়ার জায়গা। খাওয়ার টেবিলে বসে বোনকে জিজ্ঞাসা করি—টুটুল ঘুমিয়েছে? টুটুল পাঁচ বছর বয়সের ভাগনে। আমার আপন বোন নয়, দূর সম্পর্কের। তাতে কী আছে! বস্তুত রোজ আমি বোনকে একই প্রশ্ন করি—টুটুল ঘুমিয়েছে কিনা। কেননা কোন নতুন কথা খুঁজে পাই না। চুপচাপ খাই। খাওয়ার পরে টেবিল ল্যাম্প জ্বেলে বই পড়ি। বই পড়তে পড়তে দুচোখ ভরে ঘুম নেমে আসে।

যখন আমি এমন ছেদহীন জীবন-সূচীর স্রোতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত ছিলাম, যখন আমার সাঁইত্রিশটি বসন্ত অতিক্রান্ত হয়েছে হরেক প্রতিকূলতার সঙ্গে পাঞ্জা কষতে কষতে, এমন সময়ে আচমকা দমকা হাওয়ায় যেন সব ওলট পালট হয়ে গেল। চলতে চলতে যেন হঠাৎ সমুদ্রের মুখোমুখি হলাম।

আমি ঘরে বসেছিলাম। কিছুদিন কেমন যেন ক্লান্তি অনুভব হচ্ছিল। অথচ কারণ খুঁজে পাচ্ছিলাম না। কিছু হয়তো ভাবছিলাম, তন্ময় হয়ে। এমন সময়ে সিঁড়িতে কাদের পায়ের শব্দ বাজল। আমি তাকিয়ে দেখলাম। আমার বোন, ভাগনে এবং এক তরুণী।

বোন পরিচয় করিয়ে দিল—আমার ননদ সম্পর্কে হয়, অলকা. অলকানন্দা মিত্র। এলাহাবাদে মেয়ে স্কুলে মাস্টারীতে ঢুকেছে। কয়দিন এখানে বেড়াতে এসেছে। আবার চলে যাবে। মাঝে টুটুল বাধা দেওয়ায়, নইলে বোন একটানা আরও অনেকক্ষণ পরিচয়-পর্বটা চালাত বলেই বিশ্বাস। মেয়েরা কথা বলতে শুরু করলে আর থামতে চায় না। টুটুল আমার থুথনিতে হাত দিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করল—মামু ও মামু, অলকা নয়. টুকু পিসি। হঠাৎ চোখাচোখি হয়ে গেল দুজনের। ওর দুচোখে যেন কৌতুকের বিদ্যুৎ খেলা করছে। আমার বুকের গভীরে মোচড় দিল। আমি ঘুরে আবার ওকে দেখলাম। কত বয়স হবে? বছর পঁচিশ খুব বেশি হলে। কমই হবে হয়তো কিছুটা। ছিমছাম ছোটখাটো চেহারা। ও কৌতূহলী দৃষ্টি দিয়ে সব দেখল, দেওয়ালের ছবি, আলমারি। এবং তির্যক দৃষ্টি দিয়ে আমাকেও। ওর কটাক্ষে কী ছিল জানি না। আমি দারুণ অশান্ত হয়ে গেলাম। ওর সঙ্গে আলাপ করতে ইচ্ছে করছিল। কী বলব ঠিক করতে পারলাম না। অথচ প্রথম দর্শনেই আমি ওর কাছে হেরে গেলাম। আমি বোনের সঙ্গে কথা বলতে বলতে সিঁড়ি পর্যন্ত এগিয়ে গেলাম। ওরা নেমে গেল। অলকা নীচে নেমে আবার একবার আমার দিকে দেখল। আমিও ওকে দেখলাম। কে যেন, আমায় বলে দিল. এতোদিন আমি এরই প্রতীক্ষায় ছিলাম।

ঘরে ফিরে আয়নার সামনে দাঁড়ালাম। একটা দীর্ঘশ্বাস উছলে উঠল। যেন অনেক দেরি হয়ে গেছে। আয়নার উপর আমার অবয়বের ছায়া পড়ল। এখনও আমার শরীর ঋজু, পেটে মেদের স্পর্শ নেই, এক গাছি পাকা চুলও আমি খুঁজে পেলাম না। অনেকে ঠাট্টা করে বলে বয়স নাকি আমি লুকিয়ে রেখেছি। এতদিন আমি সারা পৃথিবীকে দেখেছি পরম আগ্রহের সঙ্গে। এবার আমার নিজের দিকে দৃষ্টি ফেরালাম। একটা সামান্য মেয়ের কাছেও নিজেকে অকিঞ্চিতকর মনে হল।

আমি ইদানীং অনিয়মিত ডায়েরী লিখতাম। টুকিটাকি নিজের কথাতেই

ঠাসা থাকত। সেদিন রাত্রে ডায়েরীতে অলকার কথা লিখলাম, অলকানন্দার কথা। কিন্তু টুকু নামটাই আমার পছন্দ। ও হঠাৎ আমাকে অমন করে দেখল কেন? আজ পর্যন্ত কেউ আমাকে এমনি দেখেনি।

কিছু পরীক্ষা পাশের পড়া জমে ছিল। পড়া হল না। শুয়ে পড়লাম নির্দ্ধারিত সময়ের কিছু আগেই। ঘুম এল না নানা কথা মনে হতে লাগল। শৈশব, কৈশোরের কথা। মনে হলো, যেন আমি বহু দূর দেশ থেকে হেঁটে এসে এক জায়গায় স্থির হয়ে গেছি। সামনে অন্ধকার, কী আছে জানি না। কৈশোরের ছবি সবার জীবনেই বুঝি সোনার জলে আঁকা থাকে। বস্তুত বহু দূর দেশ থেকে আমি এখানে এসে পৌঁচেছি। কৈশোরের কথা মনে হলেই—খাল, নদী, সবুজ গাছ-গাছালি, শস্যক্ষেত্র স্মৃতির ক্যানভাসে ভাসে। আমার রেণুর কথা মনে পড়ে। রেণু কাকীমার দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়া। ছোট বেলায় আমি বাবা মাকে হারিয়েছি। তাই ছোট বেলাটা কেটেছে কাকা কাকীমার আশ্রয়ে। সেখানে স্নেহ মমতার ছিটে ফোঁটা ছিল না, ছিল শাসনের বাড়াবাড়ি।

তখন আমার বয়স সতের, সবে ম্যাট্রিক পাশ করেছি। নারী সম্পর্কে কিছু কিছু কল্পনা তখন মনে জমে উঠেছে। তখনি শুনলাম, কাকীমায়ের ইচ্ছে আমি রেণুকে বিয়ে করি। কাকীমার চোখে এতদিনে আমার কিছু মূল্য ধরা পড়ল। আড়ালে আবডালে রেণুকে দেখার চেষ্টা করতাম। কিন্তু রেণু পলাতকা হরিণীর মতো সদাই পালিয়ে বেড়াত আমার দৃষ্টির সামনে থেকে। আমিও দারুণ ভীরু ছিলাম সে বয়সে। একদিন কাকীমা একরকম ধমকে রেণুকে পাঠিয়েছিলেন, আমার কাছে চায়ের কাপ হাতে দিয়ে। রেণু চায়ের কাপটাকে আমার টেবিলের উপর কোনক্রমে রেখে ছুটে পালিয়ে গিয়েছিল। আমি চোখ তুলে তাকিয়ে দেখেছিলাম, শ্যামলা রংয়ের রোগা চতুর্দশীকে। তার হাতে একগোছা লাল চুড়ি ছিল। তারপরের ইতিহাসটা দারুণ সংক্ষিপ্ত। কাকার অমত থাকায় রেণুর সঙ্গে আমার বিয়ে হয়নি।

বিশ বছর কেটে গেল, নিষ্ঠুর রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তে পাক খেতে খেতে। কতো ওলট পালট, নতুন ইতিহাস। আমি জীবন সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়লাম, সুখের বন্দরের নিশানা দেখে। কোথায় ভেসে গেল এক তুচ্ছ কিশোরী রেণু, সবুজের ছায়ায় ঢাকা গ্রাম, শস্যক্ষেত্র, তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকা এক

অলৌকিক রেল স্টেশন। এখন আমি যে মাইনেটা পাই সেটা একটু মোটা মোটা গোছের। এর মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রী আমি দখল করেছি। আরও অনেক পরীক্ষা পাশ আমি করেছি। ডিগ্রীগুলি নামের পাশে জুড়ে দিলে বেশ লম্বা হবে। আগে পরীক্ষা-পাশে একটা রোমাঞ্চ ছিল, আজকাল তাও ভোঁতা হয়ে গেছে। এখন কোন কিছুতে চাঞ্চল্য বোধ করি না। আর একটা অফিসের পরীক্ষা পাশ করতে পারলেই আমি কাঁচের ঘরে ঢুকে পড়ব। চেম্বারের সামনে পিতলের প্লেটে নাম লেখা থাকবে—বরেন বসু। রোজ সকালে সে-নামের উপর ব্রাশো দিয়ে ঘষা হবে, যাতে নামের ঔজ্জ্বল্যে ঘাটতি না পড়ে। এখন সব কিছুতে ক্লান্তি বোধ করি। সব কিছুকে নিরাসক্ত ভাবে দেখি। ভয় হয়, ওই চেম্বারের ভিতরে ঢুকে বুঝি সত্যজিৎ রায়ের ছবির নায়কের মতো ফ্রিজ হয়ে যাব।

সুখটা কী, কোথায়। আজকাল এসব অস্তিত্বের প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয় প্রায়শ। নিজে নিজেকে নিরন্তর ব্যবচ্ছেদ করি সত্য সন্ধানের অভিলাষে। মাঝে মাঝে নিজে নিজে বিড়বিড় করি—আমার দুঃখ কোথায়। আমার দুঃখ কোথায়! আমার···দুঃখ···দুঃখ দুঃখ: তখন বুকের মধ্যে লুকিয়ে থাকা দুঃখ ধড়ফড়িয়ে ওঠে। অখ্যাত কিশোরী রেণু, আমার জন্মভূমি পূর্ববাংলা একাকার হয়ে যায়। হঠাৎ আবিষ্কার করি, রেণুর সাথে আমার বিয়ে না হওয়ায় যেন এক ভীষণ বিপর্যয় ঘটে গেছে! ভাবি, রেণু যেন এখনও তেমনটি আছে। ওকে দেখতে ইচ্ছে করে। পূর্ববাংলার এক দরিদ্র স্কুল শিক্ষক আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে। আবার নিজেই হাসি, নিজের কল্পনার অলজ্জাবিত আতিশয্যে। মনে হয়, কিছু করণীয় নেই বলেই হয়তো, নিজেকে আপ্লুত করে রাখি এক অলীক দুঃখ বোধের রেশমগুটির অন্তরালে।

এই দুঃখ বোধের বন্দি-দশা থেকে আমাকে বুঝি উন্মুক্ত প্রান্তরে নিয়ে যাবে অলকা। আমার রক্ত করবীর নন্দিনীর কথা মনে হয়। রাত্রে সুনিদ্রা না হওয়ায় চোখ জ্বালা করছিল। এখন অলকা নীচে কী করছে। আমার একবার নীচে যাওয়ার কথা ইচ্ছে হল। মনে হল, বোন চমকে উঠবে। দাদা, তোমার তো এখন এখানে আসার কথা নয়। সংকোচ হলো। পাছে বোনের কাছে ধরা পড়ি। অথচ অলকার কাছে ধরা পড়তে আমার লজ্জা নেই। তবু নীচে নামতে পারলাম না। সিঁড়ির মুখে গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম। অলকাকে

দেখতে পাওয়া যায় কী না। আমার এতদিনের বন্দিত শৃঙ্খলাটাকেই এখন শৃঙ্খল বোধ হলো। আমি নিজের কাছে নিজে বন্দী হয়ে আছি।

অফিসের এতদিনের প্রিয় কাজকর্ম বিস্বাদ লাগল। আমি বসে বসে একটার পর একটা সিগারেট টানতে লাগলাম। একজন এসিষ্ট্যাণ্ট এসে বলল—স্যার, আপনার শরীর খারাপ না কী? আমি চমকে উঠলাম—না-না-কৈ না তো। বেলা চারটে বাজলে দেখি, সারা ডালহৌসী স্কোয়ার জুড়ে হলুদ রোদ্দুর, উড়ু উড়ু উদাসী হাওয়া। এমন তো এর আগে কখনও লক্ষ্য করিনি। আমি হঠাৎ চাপরাশিকে ডাকি এবং ষ্টিলের আলমারি বন্ধ করতে বলি। এবং আমার চেয়ে তরুণ বয়সীরা যারা মাঝে মাঝেই আমার চোখের আড়াল দিয়ে ছুটছাট অফিস পালায়, আমি আজ ওদের আড়াল করে অসময়ে অফিস থেকে বেরিয়ে পড়লাম।

আমার বাড়ীর সামনে রাস্তা ঘেঁষে ছোট্ট একটা পার্ক ছিল। কেমন ঘরোয়া ঘরোয়া। ছিল যুঁই অপরাজিতা আর নানান ফুলের সম্বৎসর সমারোহ। পাতা বাহারের সারি। একটু আনমনা ভাবেই বাড়ি ফিরছিলাম। হঠাৎ টুটুলের চিৎকারে দৃষ্টি ফেরালাম। দেখলাম টুটুল অন্য ছেলেদের সঙ্গে খেলায় মেতেছে। অলকা অন্য একটা মেয়ের সঙ্গে কথা বলছে। আমাকে দেখেই স্বভাবসিদ্ধ দৃষ্টিতে তাকাল। আমার বুকের মধ্যে বেদনা তিরতিরিয়ে উঠল, কিছু কথা বলতে ইচ্ছে হল। এক মুহূর্ত দাঁড়ালামও। কিন্তু কি কথা বলব! বাড়ি চলে এলাম। কতো অকথিত কথা মনের মধ্যে রইল, কথা বলা হল না।

ডায়েরীতে লিখলাম—অলকা, আমি তোমার প্রেমে পড়ে গেছি। একথা লিখতে আমার নিজেরই লজ্জা করছে। তবুও মনে হচ্ছে তোমারও আমাকে ভালো লেগেছে। অথচ আমি এক নিবিড় যন্ত্রণায় বিদ্ধ হচ্ছি। নিজের কথা অন্য কাউকেও বলতে ইচ্ছে হচ্ছে, অথচ কাকে বলব। অলকা তুমি কী বোঝোনা আমার আকুলতা। তুমিত বেশ আনন্দে আছো। অলকা তুমি কী নিষ্ঠুর।

ডায়েরীতে লেখাটুকুকে কেটে ফেলি। নিজের কাছেই নিজে লজ্জা পাই ছেলেমানুষীতে।

অফিসে গিয়ে মনোযোগ দিয়ে কাজ করি। সহকারীদের তাড়া লাগাই। আমার ষ্টেনো মিস, সেনগুপ্ত, একটু বেশি বয়সেই একজন পাঞ্জাবীকে বিয়ে

করে এখন মিসেস মালহোত্রা হয়েছেন। তাকে ডিকটেশনের পর ডিকটেশন দিই। তার রক্তাক্ত ওষ্ঠ কিম্বা মুখাবয়বের দিকে একবার আড়চোখেও তাকাই না। অফিসের পরেও কাজ করি। সন্ধ্যা গভীর হলে বেরিয়ে পড়ি। উদ্দেশ্যহীন ভাবে হাঁটতে হাঁটতে নিউ মার্কেটে ঢুকে পড়ি। সেলসম্যান সম্বর্দ্ধনা জানায়—আসুন স্যার। সেলসম্যানরা বুঝি জ্যোতিষী হয়, আমাদের হৃদয় দেখতে পায়। একটা ফুল ছাপ দেওয়া হলুদ রংএর বুশসার্ট বের করে। বলে—স্যার, এটাই আপনার ভালো হবে। আমারও পছন্দ হয়, তবু আমতা আমতা করি। বলি, ঠিক অত রংবেরং শার্টতো পরিনে। সেলসম্যান বলে—একবার পরেই দেখুন না। পরিজন যত্ন করে যেমন খাওয়ায়, তেমনি যত্ন করে ও আমার শার্ট টা গছিয়ে দিল। আমি নিজেও মনে মনে স্থির করি। না একটা পরিবর্তন চাই, আমি দারুণ বুড়িয়ে যাচ্ছি। একটা প্যান্টের কাপড় কিনে, হালক্যাসানের এক দর্জিদোকানে জমা দেই। ভাবি, এতদিনের একঘেঁয়ে পোষাক থেকে এবার মুক্তি নেবো। অথচ এই পোষাক পরিচ্ছদ ছিল আমার এতদিনের প্রিয়, রুচিসম্মত।

দর্জিদোকান থেকে ফুটপাতে পা দিয়েই বিনয়ের সামনে পড়ি। বিনয় স্বভাব সিদ্ধ উচ্ছলতায় নেচে ওঠে—হ্যালো, বরেন।

আমিও ওকে দেখে খুশি হই। বিনয় আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ব্যাচিলর। মির্জাপুরে একটা হোটেলে থাকে। চাকরি বাকরি ভালোই করে, ঘুষটুষও আছে। তাই নিত্য নতুন টাকা ওড়াবার ফন্দি খোঁজে। বিনয়কে আমার ভালবাসার ভালবাসার মনে হয়। তাই যোগাযোগ কম রাখি। কিন্তু আজ তাকে দেখে আমার খুব ভালো লাগল। বস্তুত আমি একজন সঙ্গী খুঁজছিলাম। বিনয় বলল—এ্যাই চল, মাল খাবি? আমি এক কথায় রাজী হয়ে যাওয়াতে বিনয় যেন আশ্চর্য হলো।

দু পেগ খাওয়ার পরেই আমার কেমন নেশা নেশা ভাব মনে হলো। বিনয় খেয়েই চলল। আমি চোখ বুঁজে অলকার ছবি ভাবতে লাগলাম সেই ছোট-খাটো মুখ, নাকের ডানদিকের আঁচিল। টলটলে একজোড়া চোখ। যেখানে আনন্দ, বিষণ্ণতা মেঘ-রৌদ্রের মতো অবলীলাক্রমে খেলা করে। না, পারলাম না। বার বার আমার টেনো মিস. সেনের মুখ চোখে ভাসল। ব্রণ শোভিত প্রসাধন করা মুখখানা। ওর আমার ওপর দুর্বলতা ছিল। আমি জানি।

এখনো আছে, এমনকি মালহোত্রাকে বিয়ে করার পরেও। বিনয় এক সময় মদ খাওয়া বন্ধ করল। অশ্লীল কথাবার্তা বলতে লাগল। আমার এসব কথা পছন্দ ছিল না। এখন খারাপ লাগল না। আমি ক্যাবলার মতো হাসছিলাম। হঠাৎ বলে ফেললাম—আচ্ছা বিনয়, আমার এখন প্রেম হতে পারে? যেন বিনয়ের অভিমতটা আমার কাছে ভীষণ জরুরী। বিনয় বলল—শালা তোর পে-রেম। হো হো হো। হাসি আর থামে না। হাসির দমকে ওর বিরাট শরীর কাঁপতে লাগল। কেবিনের কাঁচের পার্টিশন কাঁপতে লাগল। টেবিলে রাখা মদের গ্লাস, শূন্য বোতল ঝন ঝন শব্দে নীচে পড়ে গেল। হাসি আর থামে না।

নিজেকে ট্যাকসির মধ্যে চালান দিয়ে দিলাম। রাতের কলকাতা। ফুটে থাকা গাঁদা ফুলের মতো আলো দেখতে দেখতে ঘরে ফিরলাম। তখন অনেক রাত, সবাই ঘুমুচ্ছে। অলকাও। কেন সে জেগে থাকবে। নিজেকে খুব একাকী মনে হয় আমি ওপরে উঠে নতুন কেনা বুশ শার্টটা গায়ে গলাই। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখি—খাসা দেখাচ্ছে। বিনয়কে গালাগাল করি—শালা।

পরদিন ছুটির বার। উঠতে অনেক বেলা হয়ে গেল। কিছু ভাল লাগছিল না। আঁচ পেলাম, নীচে সকলের কোথাও যাবার মহলা হচ্ছে। যা আমার স্বভাবসিদ্ধ নয় এমন একটা কাজ করে ফেললাম। নীচে নেমে গিয়ে টুটুলকে ডাকলাম। ও এক নিশ্বাসে বলে ফেলল—আমরা আজ চিড়িয়াখানা যাচ্ছি।

—কে কে?

—আমি, বাপি, মা, টুকুপিসি।

আমি হঠাৎ বলে ফেললাম—আমায় নেবে না? বলে নিজেই লজ্জা পেলাম।

টুটুল বলল—বাঘ দেখলে তুমি ভয় পাবে।

অলকা আজ খুব লাবণ্যময় করেছে। এলো চুলে বিরাট খোপা বানিয়েছে, কপালে সবুজ টিপ, শাড়ি ব্লাউজ ও সবুজ রং-এর, আমি মনে মনে বললাম—অলকা তুমি জাননা সবুজ রং আমার কী পছন্দ। ও ট্যাকসিতে উঠল, আমি ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে রইলাম। একবার ফিরেও তাকাল না। ট্যাকসিটা

পার্কের গা দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম। ভাবলাম—এ চঞ্চলতা আমার শোভা পায় না।

বিকেলে ওরা যখন ফিরল, তখন অলকার মুখে ক্লান্তি খুশি মাখামাখি করা ছিল। ট্যাকসি থেকে ওদের সঙ্গে মানসও নামল। মানস এ-পাড়ার ছেলে, আমার বিশেষ পরিচিত। ছেলেটা ভালোই। বয়স কতো হবে, সাতাশ, আটাশ। ইদানীং চুল বুলপির জঙ্গল একটু বাড়লেও, তার মধ্যে টকটকে ফরসা মুখখানা চাঁদের মতো ফুটে থাকে। অলকা মানসের সঙ্গে হাসতে হাসতে ঘরে ঢোকে। আমার বুকের মধ্যে ঈর্ষার কাঁটা বিঁধে থাকে। অভিমান টলমল করে। পুরাতন দুঃখের মতো বিষাদ টাটিয়ে ওঠে। অথচ অলকার ওপর আমার কী অধিকার আছে! কিছু মাত্র না। আমি ব্যালকনীতে দাঁড়িয়ে নিচের দিকে তাকিয়ে থাকি। বুঝতে পারি, কোথায় যেন ছন্দপতন ঘটে গেছে।

তবু নিজের সন্দেহ, সংশয়কে কোন জোরালো প্রমাণের অভাবে বাতিল করি। নিজেকে সান্ত্বনা দেই, ভাবি, আমার সঙ্গে অলকার সে সম্পর্ক সেটা কী এত পলকা যে সামান্য কিছুতে উবে যাবে? এটা নিশ্চিত মান অভিমানের পালা। অলকাকে অভিমানে মানায় ভালো। সে অভিমানকে আমি মর্যাদা দেবো। নিজে প্রতিজ্ঞা করি, অলকার জন্য আমি লক্ষ বছর অপেক্ষা করব। একবার অন্তত জিজ্ঞাসা করব, সব কী এক তরফা হৃদয় দৌর্বল্য? তার চোখে কী কোনদিন অনুরাগের ছায়া পড়েনি? কিংবা সানুগ্রহ প্রশ্রয়ের? সে কী বোঝেনি আমার অব্যক্ত আকুলতা?

একটা সুযোগ আসে অভাবিত ভাবে। রবিবার ছিল। খাওয়ার ডাক পড়লে টেবিলে গিয়ে বসি। খাবার দিলে হঠাৎ অলকার বালা পরা হাত দেখে চমকে উঠি। আমি ওপর দিকে তাকালে, অলকা চোখ ফিরিয়ে নেয়। বলি—ওরা কোথায়? আমার যেন গলা কাঁপে। অলকা মৃদু কণ্ঠে জবাব দেয়—বেড়াতে গেছে। আমার বুকের ভিতরে ঘুমন্ত কৈশোর ডানা ঝাপটাতে থাকে। আমি মরিয়া হয়ে বলতে চেষ্টা করি—আমায় এত কষ্ট দিচ্ছ কেন অলকা? তুমি জাননা, আমার বুকে এক নতুন স্বপ্ন জমাট বেঁধেছে। না, বলতে পারি না। খেতে খেতে বিষম খাই।

ছিপছিপে হালকা চেহারার সাধারণ মেয়েটার সামনে নতজানু হয়ে ওর অনুকম্পা ভিক্ষা করতে চাই। আবার ভাবি, পাশব বলে ওকে অধিকার করি।

যেন সারা পৃথিবীকে আমি চুরমার করে দিতে পারি। খাওয়া শেষ হলে ভাবি, কিছু বলব। কিছু একটা হেস্তনেস্ত আজই হোক। তাকিয়ে দেখি, অলকা আড়ালে চলে গেছে। কিছু বলা হয় না।

কালরাত্রে নতুন প্যাণ্টটার ডেলিভারি নিয়ে এসেছি। আজ সকালে অন্যান্য দিনের মতো নিত্য কর্ম করি, স্নান করে এসে সেই ফুল ছাপ দেওয়া বুশ শার্টটা পরি। হঠাৎ সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনে শার্টটাকে খুলে খাটে ছুঁড়ে দেই। কেমন লজ্জা লাগে। মানস আসে। তাকে সহাস্য অভ্যর্থনা করি। মানস লাজুক মুখে আমার সামনে বসে। প্রজাপতি আঁকা একটা কার্ড এগিয়ে দেয়। কার্ডটা খুলে দেখি। বুকের ভিতরে রক্ত যেন বরফের মতো জমাট বেঁধে যায়। একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে একটু বেসুরো হাসি হেসে উঠি—গুড্ গুড্ ভেরি গুড্। অলকার সাথে মানসের বিয়ে হয়ে গেছে কাল। প্রীতিভোজে আমার নিমন্ত্রণ।

আমি হাসলাম, কে বলে আমার জীবনে চমক নেই। সেই ফুল ছাপ দেওয়া বুশ শার্টটাকে এবং নতুন প্যাণ্টটাকে মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলি। ভাবি, এগুলো আর পরার প্রয়োজন নেই। তাই আপত্তিকর প্রমাণপত্রের মতো পুড়িয়ে ফেলব। দেশলাই জ্বালাই। এমন সময়ে পার্কের পাশে অফিসের গাড়ির হর্ণ বাজে। আগুন দেওয়া হয় না। ভাবি, আগুন দিয়ে শার্ট প্যাণ্ট পুড়িয়ে দিলেই কী সব কিছু মুছে দিতে পারব? ঘন ঘন হর্ণ বাজে। আমি আবার আমার পুরানো প্যাণ্ট আর সাদা চাইনিজ শার্ট গায়ে গলাই। সিঁড়ি বেয়ে ছুটতে থাকি। সারা পৃথিবী ব্যাপি যেন হর্ণ বাজতে থাকে। আমার বুকে, শিরায়, মস্তিষ্কের কোনে কোনে হর্ণ বাজে। আমি ছুটতে থাকি।

সূর্যবিন্দু

প্রভাসকান্তি ভদ্র

প্রায় বছর পাঁচেক পরে বাণীর সঙ্গে হঠাৎ দেখা। সময় পড়ন্ত রোদ্দুর গড়িয়ে বিকেল। শিবাজী ওর অফিস সংক্রান্ত কিছু জরুরী কাজে কলকাতায় এসেছে। দিনান্তের কাজ চুকিয়ে হোটেলে ফিরছিল। পথে বাণীকে দেখতে পেল। বাণী অন্য একটি মেয়ের সঙ্গে ট্রাম স্টপেজে অপেক্ষা করছিল। শিবাজী ভীড় কাটিয়ে কাছে এসে দাঁড়াতেই বাণী যারপর নাই চমকে উঠল। অত্যুৎসাহে বিস্ময় প্রকাশ করে বলল, কী আশ্চর্য তুমি?

—হ্যাঁ, আমি শিবাজী সিংহ সুদূর বোম্বাই থেকে কলকাতায় এখন তোমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে।

—তুমি তাহ'লে বম্বেতে চাকরি করছো—জানতামই না। পরীক্ষার পর সেই যে ডুব মারলে আর কোন খোঁজ খবর নেই। একমুঠো দীর্ঘশ্বাস উড়িয়ে দিয়ে কিছুটা অনুযোগের সুরে বাণী জবাব দিল।

একটা ট্রাম এসে স্টপেজে দাঁড়াতে বাণীর সঙ্গিনী মেয়েটি ঝটিতি উঠে পড়ল। যাবার আগে বলে গেল, আমি চললাম ভাই। বড্ড দেরী হয়ে গেছে। বাণী মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। ট্রামটা চলে যেতে মুখ ফিরিয়ে শিবাজীর বিস্ময়কর চোখ দু'টোর দিকে তাকাল। ওর কৌতূহলে প্রলেপ দিয়ে বলল, আমার অফিসের বন্ধু—শান্তা। নতুন প্রেম চলছে। এ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। তাই—

শিবাজী যথেষ্ট অনাগ্রহ দেখিয়ে বলল, জানতে চাইনে। তুমি বরং নিজের কথা বল। তোমার স্বামী সন্তান সংসারের কথা।

—আমার সন্তান হয়েছে সে খবরও রেখেছো দেখছি। কিছুটা তির্যক ঢঙে বলল কথাটা। পরক্ষণেই স্বভাব সুলভ আন্তরিকতায় জিগ্যেস করল, বলবে কোথাও? হাতে সময় আছে?

শিবাজী একরকম অকারণেই ডান হাতের কব্জি ঘড়িতে চোখ বুলিয়ে নিল। বলল, অফুরন্ত সময়। এখানে সময় কাটতেই চায় না। মাত্র চারদিন

কলকাতায়, অথচ মনে হচ্ছে কতদিন হ'ল বম্বে ছেড়ে এসেছি। এখানকার লাইফটা বম্বের তুলনায় অনেক শ্লো।

বাণী স্মিত হেসে বাঁকা দৃষ্টি ফেলে কিছুটা অপ্রাসঙ্গিকের মত বলল, নিঃসঙ্গতা বিষণ্ণতা তোমার চিরকালের বিলাস। চল, একটা ভাল রেষ্টুরেন্ট দেখে খানিকক্ষণ বসা যাক।

শিবাজী বলল, এই অঞ্চলটা সম্পর্কে আমি একান্তই অনভিজ্ঞ। ভালমন্দ তোমাকেই বেছে নিতে হবে।

বাণী আবার তির্যক চেয়ে হাসল। বেশ অর্থপূর্ণ হাসি। নিজে থেকেই সামনে পা বাড়িয়ে বলল, চল। ট্রাম লাইন পার হয়ে হাঁটতে হাঁটতে কথা জুড়ল, অঞ্চলটা আমারও তেমন পরিচিত নয়। তবু যেহেতু বম্বে থাকি না তাই কিছুক্ষণ বসার মত ভীড় কম একটা জায়গা জানা আছে।

শিবাজী ইচ্ছে করেই নতুন করে কোন জবাব দিল না। বাণীর কথার মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন শ্লেষ ছিল সেটা গায়ে মাখল না। বরং আলতো করে হাসল। এবং বাণীকে অনুসরণ করে একটা নিরিবিলি রেস্তোরাঁয় ঢুকলো। ভিতরে ঢুকে বাণী জিগ্যেস করল. কোথায় বসবে—কেবিনে, না বাইরে?

—যা তোমার ইচ্ছে। কোনটাতেই আমার আপত্তি নেই। অল্প বয়সী বেয়ারা ছেলেটি কাছে এসে দাঁড়িয়ে ছিল। ওদের কথার সূত্র ধরে বলল, কেবিন খালি নেই। একটু দেরী করুন, এক্ষুণি খালি হয়ে যাবে। কথাটা বলেই সে ব্যস্ততার সঙ্গে মৌরী চালা ডিসে বিলসহ একটা কেবিনের দরজায় টোকা মারল এবং শব্দ করে ভিতরে ঢুকলো।

শিবাজী এবং বাণী পরস্পরের চোখে চোখ রেখে মৃদু হাসল এবং নির্বাক দাঁড়িয়ে থাকল।

কিছুক্ষণ বাদেই একদম কোণের কেবিনটা ফাঁকা হয়ে গেল। অল্প বয়সী ছেলেটি টাকার হিসেব মেলাতে মেলাতে কাছে এসে চটপট আহ্বান জানাল, আসুন স্যার। কেবিন খালি।

কেবিনের ভিতরে ঢুকে ওরা দু'জন পাশাপাশি বসল। ছোট্ট কেবিন। দু'টোই সীট। সামনে দেয়ালের গায় সুন্দর একটা বেলজিয়াম কাঁচের আয়না আঁটা। যদিও ভিতরে অস্বচ্ছ আলো, কিন্তু ওদের যুগল প্রতিচ্ছবিটা বেশ উজ্জ্বল লাগল।

শিবাজী ওর হাতের এ্যাটাচি কেসটা পাশে দাঁড় করিয়ে রাখল। বাণী ওর কাঁধের ঝুলন্ত ব্যাগটা টেবিলের ওপর শুইয়ে দিল। তারপর কাপড়ের আঁচল দিয়ে মুখের মালিন্য মুছতে তৎপর হ'ল।

এই নিয়ে অনেকবার হ'ল বাণী শিবাজীর সঙ্গে পর্দাঢাকা কেবিনে ঢুকলো। বাণীর পিঠের ওপর চেয়ারে হাত রাখল শিবাজী। তারপর নিম্নস্বরে বলল, জানো বাণী—আমরা সকলেই এক একজন ছোটখাটো নাবিক বলা যেতে পারে। আমরা দিশেহারা হয়ে আকাশের ধ্রুবতারা খুঁজি। স্নেহ প্রীতিতে জড়াই—হাটে-বাজারে, নয়তো খেয়া-ঘাটে।

বাণী কথাগুলোর সঠিক অর্থ খুঁজে পেল না। শুধু ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি ফুটিয়ে তুলল। চোখের মণি দু'টো বার কয়েক নাচালো। ভুরু দু'টোতে অপূর্ব ঢেউ খেলে গেল। কিন্তু কোন জবাব দিল না।

শিবাজী সামনের আয়নায় বাণীর ঠিকরে পড়া হাসির রেশ দেখে দ্বিধাহীন ভাবে মন্তব্য করল, তোমার হাসিটা কিন্তু ঠিক আগেকার মতই সুন্দর আছে।

—আর আমি? করতলে মুখ পেতে নিষ্পলক চোখ চেয়ে জানতে চাইল বাণী। শিবাজী ওর আপাদমস্তক জরিপ করে জবাব দিল, একটু মুটিয়েছো বটে, তবে তাতে সৌন্দর্যের কোন ক্ষতি হয়নি।

বাণী আত্মতৃপ্তিতে শব্দ তুলে সোচ্চার হাসল। হাসির রেশ স্তিমিত হতে জিগ্যেস করল, বিয়ে করেছো?

—না।

—কেন?

—কে বিয়ে করবে আমায়। তাছাড়া মনের মত মেয়েই বা পেলাম আর কোথায়।

—আমি কিন্তু তোমাকে চেয়েছিলাম। তুমি বারবার আমাকে এড়িয়ে গেছ। অথচ, আমি যে তোমার মনের মত নয়, একথা কখনো বলনি।

কথাটা সত্যি। তাই শিবাজী কোন জবাব খুঁজে পেল না। কিছুক্ষণ নির্বাক থেকে আত্মমগ্ন গভীরে ডুব দিল। ফেলে আসা কলেজ জীবনের দুঃখ দারিদ্র্যজনিত দিনগুলোর কথা মনে পড়ল। সে এক সময় গেছে—সংসারের প্রতি যখন তার অনেক দায় দায়িত্বের বোঝা। অনেক ভাবনা চিন্তা। বাবা

ক্ষয়রোগে হাসপাতালে মৃত্যুর দিন গুনছেন। মা অর্ধপাগল হয়ে মানসিক হাসপাতালে। দু'টো বিবাহযোগ্যা বোন এবং সে সকাল বিকেল ট্যুইশানি করে সংসার চালাবার সংগ্রামে ব্যস্ত। প্রেম-ভালবাসা স্বপ্ন এবং রোমান্টিকতা তখন শুধু বিলাসিতা নয়, সম্পূর্ণ ধারণার বাইরে। এখনও মনে পড়ে এমন দিনও গেছে যেদিন উনুনে জল চাপিয়ে চালের জোগাড়ে যেতে হয়েছে।

এতকিছু খবর বাণী জানে না। শিবাজী ইচ্ছে করেই কোন দিন কাউকে জানিয়ে করুণা কুড়োতে চায়নি। যদিও সে সব দুঃখময় পর্ব আজ অতীত স্মৃতিমাত্র। বাবা মা কেউই এখন বেঁচে নেই। দু'বোন সুপাত্রে বিবাহিতা এবং নিজে কার্যক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত, তাই বাণীকে সে সম্পর্কে কিছুই বলল না। অনেকক্ষণ নিশ্চুপ থাকার পর বুক উজাড় করা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, আমি জানি তুমি আমাকে সত্যিকার ভালবাসতে এবং এখনো ভালবাসো। সেজন্যেই তোমাকে ঠকাতে চাইনি। আসলে, সে সময় আমাদের দু'জনের মিলন পর্বত প্রমাণ অসম্ভব দিয়ে ঘেরা ছিল। সে জন্যই তোমাকে এড়িয়ে গেছি।

—কিন্তু তুমি হয়তো বিশ্বাস করবে না, বিয়ের পরও বিশেষ বিশেষ কোন মুহূর্তে তোমাকে ভীষণ মনে পড়ে। তখন মনে হয় জীবনে এমন অনেক কিছু গুপ্ত অনুভূতি আছে যাকে ব্যবধান দিয়ে দূরে রাখা যায় না। অর্থাৎ মনে জুড়ে বসে থাকা সেই দুর্বল অনুভূতিকে তাড়াতে হলে সমস্ত মনটাকেই মেরে ফেলতে হয়।

—তোমার সেই নির্মল পবিত্র মনটার প্রতি আমার কিন্তু আজও গভীর শ্রদ্ধা আছে। ভেবে দেখতো আমাকে কী দায়ী করা চলে?

—না। একটুকুও না। ভুলটা আমারই। আমি জানতাম, তোমাকে পাওয়া সম্ভব নয়। তুমি প্রেমে পড়ার মত ছেলেই নয়। প্রেমের জন্য যে স্থিতি দরকার তা তোমার মধ্যে ছিল না। তবু কেন যে অমন হয়ে গেল—ভাবতে অবাক লাগে।

এতক্ষণ বেয়ারা ছেলেটা হয়তো অন্যত্র ব্যস্ত ছিল। নয়তো অল্প বয়সে অধিক অভিজ্ঞতাতেই অনুমান করেছিল, অনেকের মত এরাও শুধু খেতে নয় দু'দণ্ড নিরিবিলি সময় কাটাতে এসেছে। তাই প্রথমে সেই যে দু' গেলাস জল দিয়ে গেছে আর এদিকে আসেনি। এখন এলো। কাছে এসে অর্ডার সম্পর্কিত নীরব জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে দাঁড়াতে ওদের দু'জনের কথায় ছেদ পড়ল।

ওরা দু'জনে পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। শেষে বাণীই জিগ্যেস করল, কী খাবে বল ?

—যা খুশি বলে দাও।

—না না, তুমিই বলো।

শিবাজী খাবার প্রতি খুব একটা গুরুত্ব দিতে চাইল না। দুপুরের লাঞ্চটা খুব হেভী হয়ে গিয়েছিল। তাছাড়া আজকাল চপ কাটলেটে তার খুব একটা রুচি নেই। সে চাইনীজ খাবারই বেশি পছন্দ করে। চিলি চিকেন এবং ড্রিংকস্ হ'লে তো কথাই নেই।

বেয়ারা ছেলেটা ওদের দু'জনকে অর্ডার নিয়ে কাটাকুটি খেলতে দেখে সময় অপচয় করল না। মেনু রেখে ব্যস্ততার সঙ্গে চলে গেল। যাবার আগে বলে গেল, আপনারা ঠিক করুন—টেবিল ঠুকে আওয়াজ দেবেন। আমি আসব।

বাণী লজ্জা পেয়ে বলল, ছি ছি কী ভাবল বলতো। তারপর মেনু লিস্টের ভাঁজ করা পাতা দু'টো খুলে ধরে জিগ্যেস করল, বল কোনটা তোমার পছন্দ—হুইস্কি, কোল্ড ড্রিংকস না হেভী ফুড ?

—লাইট কিছু নাও।

—এতক্ষণ বসে থেকে তা হয় না। তুমি বরং লিকুইড কিছু খাও। সকালে কখন খেয়ে বেরিয়েছো ?

ঠিক সেই পুরনো প্রশ্ন। শিবাজীর মনে পড়ে গেল, কলেজ জীবনে বাণী ঠিক এমনি হৃদয় ছুঁয়ে প্রশ্ন করত। মফস্বল থেকে ট্রেনে কলেজ আসতো সে। নানা কারণে সব দিক সামলে প্রথম ক্লাস এ্যাটেণ্ড করার জন্য অনেক দিনই স্নান খাওয়া হ'ত না। বাণী কেমন করে যেন ঠিক বুঝে যেত, কবে তার খাওয়া হয়নি। জিগ্যেস করলে সে কিছুতেই মিথ্যে বলতে পারত না। চুপ করে থাকত। বাণী একরকম জোর করেই তখন হোটেলে নিয়ে গিয়ে খাওয়াত। নিজের ব্যাগ থেকে বিলটা মিটিয়ে দিত। কোন আপত্তিই শুনতো না। অতীতের সে সব স্মৃতি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে একটা দিনের তাৎপর্যময় ঘটনা শিবাজীর বিশেষ করে মনে পড়ল। দুপুরে আচমকা প্রবল বৃষ্টিপাতে কলেজস্ট্রীটের রাস্তায় তখন আঁথে জল। ট্রাম বাস বন্ধ। ক্লাস শেষে বাণী বলল, চল কোথাও বসে চা খাওয়া যাক। ততক্ষণে জল নেমে যাবে। শিবাজী প্রত্যুত্তরে আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেছিল, চা খাওয়ার নাম করে সেইতো তোমার

জোর করে হেভী ফুড খাওয়ানো—দরকার নেই। তার চেয়ে ফাঁকা কোন ক্লাসরুমে বসে গল্প করি চল।

বাণী উচ্ছ্বসিত হাসি ছড়িয়ে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলেছিল, বেশতো আমি কোন জোর করবো না। তুমি যা খেতে চাইবে তাই খাওয়াবো।

—সত্যি?

—হ্যাঁ সত্যি।

—যা খেতে চাইবে তাই খাওয়াবে? শেষের কথা দু'টোতে বেশ জোর দিয়ে উচ্চারণ করল শিবাজী।

—হ্যাঁ তাই খাওয়াব। হালকা মেজাজে জবাব দিল বাণী।

—বলছো বটে কিন্তু পারবে না। কথাটা বলে শিবাজী বেশ অর্থ পূর্ণ হেসেছিল। সেই হাসিটা আত্ম অহংকারে আঘাত করায় বাণী বেশ দৃঢ়তার সঙ্গেই বলেছিল, কিছু কেনাকাটা করবো ভেবেছিলাম সেটা না হয় আজ করবো না। চল, দেখবো তুমি কত খেতে পার। কথাটা শেষ করেই এক রকম জোর করে শিবাজীর হাত ধরে টেনে নিয়ে পর্দা ঢাকা কেবিনে ঢুকেছিল। ঢুকেই জিগ্যেস করেছিল, বল কী খাবে—কত খাবে তুমি।

—খুব বেশি না, সামান্যই। কিন্তু তুমি কিছুতেই খাওয়াতে পারবে না, আমি তা ভাল করেই জানি।

শিবাজীর কথাগুলো এত শান্ত অথচ দৃঢ়তার সঙ্গে বলা দেখে বাণী হঠাৎ থমকে গিয়েছিল। বেশ কিছুক্ষণ নির্বাক চোখ চেয়ে থেকে কেমন যেন আনমনা হয়ে গেল। মুখটা পাণ্ডুর হয়ে যায়। পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে এক ঝিলিক দুষ্টুমির হাসি ছড়িয়ে চোখের মণি দুটো নাচিয়ে জবাব দিয়েছিল, দুষ্টু কোথাকার। ভীষণ অসভ্য তুমি।

—মানলাম, আমি দুষ্টু এবং অসভ্য; কিন্তু তুমি হার মানছো তো?

—মোটেই না। তুমি যদি খেতে পার, আমিও খাওয়াতে পারবো।

—না, তা তুমি পারবে না।

—দেখই না পারি কিনা।

বাণী নতুন করে কোন কথা বাড়ায়নি। কিছুটা খেলার ছলে এবং জেতার তাগিদে অত্যন্ত হাল্কা মেজাজে চোখে চোখ রেখে ঠোঁটের পাপড়ি দু'টো নীরব সম্মতিতে শিবাজীর মুখের কাছে পেতে ধরেছিল। ওর চোখের তারা

দু'টো দারুণ উত্তেজনায় জল জল করছিল। অথচ, হাতের মুঠোর মধ্যে বাণীকে পেয়েও শিবাজী সেদিন শেষ পর্যন্ত হেরে গিয়েছিল।

সেদিনের শিবাজী আজ অনেক পাল্টে গেছে। এখন তার পরণে ধুতি পাঞ্জাবী এবং কাঁধে ঝুলন্ত কাপড়ের ব্যাগের পরিবর্তে দামী স্যুট বুট টাই এবং হাতে অভিজাত এ্যাটাচি কেস। ডান হাতের কব্জিতে বিলিতি ঘড়ি। মানসিকতায় অনেক পাল্টে গেছে। পাপপুণ্য প্রতারণা সংক্রান্ত সূক্ষ্ম সেন্টিমেন্ট গুলো খুব একটা নেই বললেই চলে। সে এখন জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী নয় বলেই এজীবনেই যা কিছু ভোগ করে নিতে তৎপর ; এবং এখনই।

অনেকক্ষণ নীরব থাকার পর পুরণো স্মৃতির ইতি টেনে শিবাজী একসময় সোনালী কেস থেকে কিং সাইজ বিলিতি ফিল্টার টিপ সিগারেট বের করল। ঠোঁটে ঝোলালো। সুদৃশ্য লাইটারের নীলাভ ফুয়েলে সিগারেট ধরালো। সুগন্ধী স্নিগ্ধ ধোঁয়ার রিং ছড়ালো। তারপর টেবিলে রাখা লানস্রাসটা আলতো করে নাড়তে নাড়তে জিগ্যেস করল, আচ্ছা বাণী, তোমার ভয় করছে না ?

—কীসের ভয় ?

—স্বামী সন্তান সংসার থাকতেও এই যে কবেকার কলেজ জীবনের কোন এক বন্ধুর সঙ্গে একা কেবিনে এখন সময় কাটাচ্ছো।

বাণী তাৎক্ষণিক কোন জবাব দিতে পারল না। নিরুত্তর মাথা নীচু করে মেঝের ওপর নখের আঁচড় কাটতে থাকল। শিবাজী স্পষ্টত দেখতে পেল, বাণীর চোখ মুখ ক্রমশই ম্লান এবং বিষণ্ণ হয়ে যাচ্ছে। স্বভাবতই সে কিছুটা অপ্রস্তুত হ'ল। নিজের ভুল বুঝতে পারল। সুতরাং বাণীকে সতেজ সহজ করে তুলতে টুকরো হাসি ছড়িয়ে বলল, রাগ করলে ? রসিকতাও বোঝ না ? কী খাব জিগ্যেস করছিলে না। বলব ?

নিমেষে বাণী পাল্টে গেল। দুঃখ ক্ষোভ এবং লজ্জা উবে গেল। খাবার কথায় পরম উৎসাহে মুখ তুলে তাকাল। চোখে মুখে খুশির আলো ছড়িয়ে বিশেষ আন্তরিকতায় জিগ্যেস করল, কী খাবে বল। সেই কখন এসেছি। ওরা কী ভাবছে বলতো।

শিবাজী জিগ্যেস করল, যা খেতে চাই—খাওয়াবে তো ?

—বলেই দেখ না।

শিবাজী বেশ কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে বাণীর দিকে চেয়ে থাকল। ওর চোখ মুখ চিবুক দেখল। ফ্যানের হাওয়ায় ওর কয়েকটা ছোট রেশমী চুল কপালের ওপর দিয়ে নাকের ডগায় দোদুল দোল খাচ্ছিল। বুকের কাপড় ঈষৎ শিথিল হয়ে সামনে ঝুঁকে পড়েছে। মসৃণ কাঁধ দেখা যাচ্ছে। উজ্জ্বল হীরকের মত চোখের মণি দু'টো।

দেখতে দেখতে শিবাজী শরীরময় প্রতিটি শিরায় অদ্ভুত উত্তাপ এবং রক্ত চাঞ্চল্য অনুভব করল। অস্থিরতার সঙ্গে অস্পষ্ট স্বরে ফিসফিসিয়ে বলল, যদি ফেলে আসা সেই কলেজ জীবনের বৃষ্টিঝরা দিনটির মত বলি, খুব সামান্যই খেতে চাই। তুমি কিন্তু আজ কোনমতেই তা খাওয়াতে পারবে না।

আজকে, এই বিবাহিত জীবনে শিবাজীর বিশেষ ইংগিত ধর্মী কথাটার গূঢ় অর্থ বুঝতে বাণীর বিন্দুমাত্র সময় লাগল না। লজ্জা সঙ্কোচ ভয়ে চোখ মুখ রক্তাভ কিংবা ম্লান বিবর্ণ হ'ল না। বরং তাৎক্ষণিক দ্বিধাহীন অনায়াস— উত্তর দিল, হয়তো আশ্চর্য হবে তবু সেদিনের মতই বলছি শোন, যদি তুমি খেতে পার—আমি নিশ্চয়ই খাওয়াব।

শিবাজী এরকম একটা সুযোগ-প্রতীক্ষায় অনেক আগে থেকেই গোপন মানসিক প্রস্তুতি নিচ্ছিল। মানসিক দৃঢ়তার অভাবে এককালে হাতের মুঠোয় পেয়ে হারানো বাণীকে আজ হঠাৎ এত কাছে পেয়ে সেই সুযোগ নতুন করে হারাতে ইচ্ছে হ'ল না। সুতরাং বিনা ভণিতায় ঝটিতি ঝুঁকে পড়ে বাণীর ঠোঁটের পাপড়ি দু'টো খুঁজতে থাকল। অথচ, আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে কিছুতেই পেল না। পরিবর্তে, চোখের সামনে বাণীর কপালে উজ্জ্বল সিঁদুরের ছোট্ট লাল বৃত্তটাকে ক্রমশঃ বিরাট একটা সূর্য হয়ে জ্বলতে দেখল।

হারিয়ে গেল

জ্যোৎস্নাময় বসু

সুনন্দার সঙ্গে আমার পরিচয় ট্রেনের কামরায়। যাচ্ছিলাম নতুন চাকরী নিয়ে বোম্বে। জীবনের প্রথম চাকরী। বোম্বে কোনদিন যাইনি এর আগে। কোথায় থাকব জানি না—তবে একেবারে অনিশ্চয় অবস্থা নয়, কারণ পকেটে একটা নিয়োগপত্র আছে। ট্রেনে উঠে ভাবনা হচ্ছিল। আমার পরিচিত একজন ভদ্রলোক বোম্বেতে আছেন অনেকদিন, ওর কাছে গিয়ে উঠব এই ভরসাতেই যাচ্ছি।

সুপ্রকাশ ঠিক আমার বন্ধু নয়, তবে আমাদের মফস্বল শহরের বাসিন্দা। সেই সূত্রে আমি তাকে চিনি, তিনিও আমাকে চেনেন। তবে ওই চেনা পর্যন্ত। মুস্কিল হল, তার ঠিকানা জানিনা। সুপ্রকাশের চেনা অচিন্ত্যবাবুর ঠিকানা জোগাড় হয়েছে। অচিন্ত্যবাবু ফিল্ম লাইনের লোক, কাজেই তার ঠিকানা পেতে মুস্কিল হয়নি। অচিন্ত্যবাবুর সঙ্গে যে সুপ্রকাশের চেনা আছে সেটা আমি কি সূত্রে জানতে পেরেছি তা আজ মনেও নেই। বোম্বেতে গিয়ে অচিন্ত্যবাবুর সঙ্গে দেখা করে সুপ্রকাশের ঠিকানা নিয়ে সেখানে গিয়ে উঠব এই স্থির করেছি। তবু ভাবনা কি আর যায়? চলেছি একদম একা, সঙ্গে একটা সুটকেশ আর বিছানা। বাংকে একটু জায়গা করে নিতে পেরেছি। সঙ্গী গুটি কয়েক বই।

সবকটা বই নিয়ে নাড়াচাড়া করছি, কিন্তু একটাতেও মন বসাতে পারিনি অনেকক্ষণ। মোগলসরাই পর্যন্ত ত প্রায় পড়তে পারিনি কিছুই। অচেনা-জায়গায় যাচ্ছি, তাও আবার বোম্বের মত শহর। নতুন চাকরী, নিজের রোজগার, মাইনের অঙ্ক, প্রথম মাইনের টাকার হিসাব ইত্যাদি নিয়েই বিভোর ছিলাম সর্বক্ষণ। মোগলসরাই ছাড়িয়ে যাবার পর অবশ্য একটা বইতে বেশ জমে গেলাম। নায়ক খুনের দায়ে বন্দী হয়েছে। কিন্তু যে সে খুনী নয় সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত। কিন্তু কে খুনী? এরমধ্যে আমি একজনকে ত খুনী বলে স্থিরই করে ফেলেছি। তবু ঠিক নিশ্চিত হতে পারছি না। বেশ উত্তেজিত

হয়ে পড়েছি। এত উত্তেজিত যে, কখন এলাহাবাদ পেরিয়ে গেছি টেরও পাইনি। নায়কের উকিলটী বেশ ভাল। কোর্টে সরকার পক্ষের সাক্ষীদের একেবারে নাস্তানাবুদ করে ছাড়ছেন। এমন সময় 'এ মিষ্টার এ মিষ্টার' বলে কে যেন আমাকে ডাকতে লাগল। কাজেই কোর্টে উকিলের কেরামতি চুলোয় গেল। দেখলাম আমাকেই—নিচের ভদ্রলোক ডাকছেন। ভদ্রলোক কেরালার অধিবাসী বলেই মনে হল, পরিবার পরিজন নিয়ে বোম্বেতেই যাচ্ছেন।

আমি নেমে আসতে একটী মেয়েকে দেখিয়ে তার সঙ্গে কথা বলতে বললেন। আমি ঠিক বুঝতে পারছিলাম না, দেখলাম তাদের পাশে একটী মেয়ে বসে বসে কাঁদছে। এবং অনেকক্ষণ যে কেঁদেছে সে তার চোখমুখ দেখলেই বোঝা যায়। মেয়েটীর বয়স সতের-আঠার হবে, এর বেশী নয় কিছুতেই। দেখতে ভাল, শ্রীময়ী। দেখলেই কিরকম যেন মমতা হয়। কেরলী ভদ্রলোক বললেন যে, মেয়েটীর কথা তিনি এক বর্ণও বুঝতে পারছেন না। ও অনেকক্ষণ ধরে বসে বসে কাঁদছে দেখে উনি কথা বলতে চেষ্টা করেছিলেন। মেয়েটী বাঙ্গালী মনে হওয়াতেই আমাকে বিরক্ত করছেন এবং সেজন্য ক্ষমাও চাইলেন।

এতক্ষণে খেয়াল হোল, হ্যাঁ, মেয়েটীকে বাঙ্গালী বলেই তো মনে হচ্ছে। আমি গিয়ে মেয়েটীর পাশে বসলাম। সুনন্দার সঙ্গে সেই আমার প্রথম আলাপ এবং এক রকম শেষ আলাপও বলা যেতে পারে। সুনন্দা যা বলল তা আমি প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারিনি। আমি রীতিমত যুবক। এবছর টেকসটাইল এঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে চাকরী নিয়ে বোম্বেতে যাচ্ছি। আমিই ভেবে অস্থির, আর কিনা একটী সতের-আঠার বছরের মেয়ে একলা বোম্বে যাচ্ছে। তাও আবার কারোর কাছে নয় একেবারে নিরুদ্দেশ যাত্রা—এ অবিশ্বাস্য। সুনন্দা বুঝতে পেরেছে যে আমি ওর কথা বিশ্বাস করছি না। ভ্যানিটী ব্যাগ খুলে হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষার এডমিট্ কার্ড দেখাল। পরীক্ষার রেজাল্টে যে ওর রোল নাম্বার নেই সেটা দেখাল, এবার বিশ্বাস হোল, কিন্তু যে মেয়ে পরীক্ষায় ফেল করেছে খবর নিয়ে ক্যানিং থেকে বোম্বের পথে পাড়ি দিতে পারে, সে কাঁদবে কেন। কাঁদবার কারণটা অবশ্য জানতে পারলাম ওরই কাছে। এলাহাবাদ পর্য্যন্ত ভালই এসেছে সুনন্দা—তেমন দুর্ভাবনায় পড়েনি। কিন্তু

P29400

এলাহাবাদে চারজন যুবক উঠে ওকে বিরক্ত করতে শুরু করে। সুনন্দা বোঝে যাচ্ছে সেকথা ওরা বুঝতে পেরেছে এবং ওকে দেখে আরও বুঝতে পেরেছে যে সে একা যাচ্ছে। সঙ্গে কোন মালপত্র নেই দেখে সেই যুবকদের নিজেদের মধ্যে কিছু কথাবার্তা হয়। সুনন্দা ওদের ভাষা বুঝতে না পারলেও এটুকু বুঝেছে সে, বোম্বেতে একবার ট্রেন থেকে নামলেই ওদের হাত থেকে নিস্তার পাওয়া যাবে না। এখন নিজের অসহায় অবস্থার কথা ভেবেই সে কাঁদতে শুরু করেছে। এ-ছাড়া আর কি করতে পারে? এবার ভাল করে নজর করে দেখলাম যে, ওর সঙ্গে ভ্যানিটী ব্যাগ ছাড়া আর কোন মালপত্রই নেই।

পড়াশুনায় সুনন্দা নিচু ক্লাস থেকেই ভাল ছিল। ক্যানিংএ থাকত। স্কুলে বরাবর ফার্ষ্ট হয়েছে। ক্লাশ ইলেভেনে উঠে ওর টনসিল অপারেশন হয়। টনসিল অপারেশনের পর থেকে কিছু মনে রাখতে পারে না। বাড়ীতে বারবার সেকথা বলেছে, কিন্তু বিশেষ কেউ কান দেননি। পরীক্ষা দিয়ে বাড়ীতে বলেছিল যে, খুব খারাপ পরীক্ষা দিয়েছে এবং মন খারাপ করে বসে থাকত। বাড়ীর লোকেরা ওকে বুঝিয়েছে যে সে লেখা পড়ায় ভাল—পরীক্ষা খারাপ হলেও ফার্ষ্ট ডিভিশন নিশ্চয়ই থাকবে, হয়ত আহা মরি কিছু রেজাল্ট হবে না। বৃত্তি পাওয়া অথবা ষ্টার পাওয়া যাবে না সেইজন্য এত মনমরা হয়ে থাকবার কোন মানে হয় না। এইসব কথা বারবার শুনতে শুনতে সুনন্দা একসময় নিজেও বিশ্বাস করতে শুরু করেছিল যে, পাশ সে ঠিকই করবে। অন্তত সেকেণ্ড ডিভিশনে তো বটেই। যাই হোক পাশ করলেই হোল। মাঝে মাঝে ভয় হয়েছে যদি ফেল করে? রেজাল্ট যেদিন বেরোবে সেদিন সে কলকাতায় যাবে বলে স্থির করল। মা আপত্তি করেছিলেন। সে কলকাতায় বেশি যায়নি—একা একা কলকাতায় গিয়ে কাজ নেই। রেজাল্ট ক্যানিংএ একটা দিন পরে পাওয়া যাবে,—একটা দিন না হয় দেরীই হোল। সুনন্দা সেকথা শোনেনি। তার পক্ষে একটা দিন অপেক্ষা করা প্রায় অসম্ভব মনে হয়েছিল। কাজেই সে কলকাতায় চলে আসে। আসবার আগে মার বাক্স থেকে ১০০ টাকাও সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে। এসে রেজাল্টের বই কিনে দেখে তাতে ওর রোল নম্বর নেই। রেজাল্ট দেখে তার কষ্ট হয়েছিল ঠিকই। পরীক্ষা খারাপ দিয়েছিল, কাজেই অতটা ভেঙে পড়েনি। কিন্তু বাড়ীর সকলে ওর রেজাল্ট ভাল হবে বলে এত নিশ্চিত যে, সুনন্দার পক্ষে বাড়ী ফিরে গিয়ে সে ফেল

করেছে এখবর দেয়া একেবারে অসম্ভব মনে হল। কাজেই সে মনস্থির করে ফেলল, আর বাড়ী ফেরা না।

লোকজনদের জিজ্ঞেস করে হাওড়া ষ্টেশনেও এসে পৌছাল। বোম্বে যাবে এটাও স্থির করে ফেলল। কিন্তু বোম্বের ট্রেন কখন বা কোথায় গেলে বোম্বের টিকেট পাওয়া যাবে, এ সব কিছুই সে জানত না। হাওড়া ষ্টেশনে এসেও দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। কাউকে জিজ্ঞেস করতেও ভরসা করতে পারছিল না। সবাই প্রায় ছুটছে। শেষে এক বুড়ো ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করতে জানতে পারল, ট্রেন ছাড়বে রাত্রির বেলা। ভদ্রলোক পালটা জানতে চাইলেন, সে একা কেন বোম্বে যাচ্ছে। সুনন্দা বানিয়ে একটা ভাল গল্পই বলেছিল এবং ভদ্রলোকও বিশ্বাস করেছিলেন। ভদ্রলোক সুনন্দাকে নিয়ে বর্ধমানে চলে আসেন এবং বর্ধমানের কোটা থেকে একটা সিট ওর জন্য রিজার্ভ করে দেন। তারপর ভদ্রলোক ওকে বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে খাইয়ে দাইয়ে সময় মত ট্রেনে তুলে দিয়ে যান। সুনন্দা ভদ্রলোক এবং তার স্ত্রীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তাদের কোন মেয়ে নেই, দুই ছেলেই বাইরে থাকে

আমিও বোম্বেতে প্রথম যাচ্ছি। আমার নিজেরই থাকবার ঠিকানা নেই বলা যায়। এ অবস্থায় আমি ওকে কি সাহায্য করতে পারি? কিন্তু সুনন্দার অবস্থা ভাবাই যায় না। তবুও তাকে সান্ত্বনা দিলাম, আমি থাকতে বোম্বে গিয়ে তাকে বিপদে পড়তে হবে না। একটা ব্যবস্থা হবেই। তারপর সুনন্দার পাশে বসে ওর সঙ্গে গল্প করতে করতে, আমার বই-এর নায়ক যে মিথ্যা খুনের দায়ে ফাঁসীতে ঝুলতে যাচ্ছে সে সব কথা ভুলেই গেলাম। সেই নায়ককে নিয়ে আমার আর কোন সমস্যাই রইল না। তখন মনে হল যে, ট্রেনটা হঠাৎ বেশী জোরে চলতে শুরু করেছে। নিমেষের মধ্যেই যেন ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস ষ্টেশনে পৌছে গেলাম।

অচিন্ত্যবাবুর বাড়ী পৌছে শুনলাম, তিনি বাড়ীতে নেই, সন্ধ্যার আগে তার বাড়ী ফেরবার সম্ভাবনাও নেই। এই খবর পেয়ে বেশ চিন্তিত হলাম। অচিন্ত্যবাবুর কাছে থেকে ঠিকানা নিয়ে সুপ্রকাশের বাড়ী চলে যাব এটাই স্থির ছিল। এবং ব্যাপারটা খুব সহজ মনে হয়েছিল। একলা থাকলেও না হয় কথা ছিল, সারাদিন কোথাও কাটিয়ে দেওয়া যেত। এখন সঙ্গে রয়েছে সুনন্দা, তার ওপর ভয়ে দুশ্চিন্তায় অনিদ্রায় ওর যা চেহারা হয়েছে। এই

অবস্থায় সারাদিন ওকে নিয়ে কোথা যাব। এই সব ভাবছিলাম। ভুলেই গিয়েছিলাম যে আমরা একটা বাড়ীর দরজায় দাঁড়িয়ে আছি এবং সেই বাড়ীর লোকেরা আমাদের লক্ষ্য করছেন। একজন মহিলা জিজ্ঞেস করলেন, আমরা কোথা থেকে আসছি। আপাততঃ কোলকাতা থেকে আসছি শুনে, তিনি অচিন্ত্যবাবুর সঙ্গে আমাদের কি দরকার জানতে চাইলেন। তখন স্থির করলাম এদের কাছে সব খুলে বলাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। বলতে শুরু করলাম। কিছুটা শোনার পর আমাদের তিনি ভেতরে ডেকে নিয়ে বাকী সব কথা শুনলেন। শুনে অচিন্ত্যবাবু না ফেরা পর্যন্ত সেখানেই থাকতে বললেন। আমাকে বাইরের ঘরে রেখে সুনন্দাকে তিনি ভেতরে নিয়ে গেলেন। তারপর স্নান করা খাওয়া এবং কিছুটা ঘুমেরও ব্যবস্থা করে দিলেন। সুনন্দার সঙ্গে আমার আর দেখা হয় নি অচিন্ত্যবাবু না ফেরা পর্যন্ত।

অচিন্ত্যবাবু সন্ধ্যার পর ফিরলেন। তার আসার খবর পেয়ে এখন আমি যেন সংকুচিত হয়ে গেলাম। তার কাছে আবার সব বলতে হল। এর মধ্যে সুনন্দাও এলো। যেন নতুন করে দেখলাম, সুনন্দা বেশ সুন্দরী। স্নান করে পরিষ্কার শাড়ী পরে এবং খেয়ে ঘুমিয়ে নিয়ে ও বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। এখানকার সহৃদয় ব্যবহারও নিশ্চয়ই কাজ করেছে। এখন সুনন্দাকে একজন পরিপূর্ণ যুবতী বলে মনে হল।

সব শুনে অচিন্ত্যবাবু কাগজ পত্র দেখতে চাইলেন। ঘটনার সত্যতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হবার পর অচিন্ত্যবাবু এত হৈ চৈ করতে লাগলেন যে, আমি অবাক হয়ে গেলাম। সুনন্দা মুহূর্তেই তার মেয়ে বনে গেল। ফিল্ম লাইনের বড় বড় বাঙ্গালীদের আড্ডা ছিল তার বাড়ীতে। তারাও সবাই এসে গেলেন, যেন একটা উৎসব লেগে গেল। সুনন্দা এর পরেও সাত দিন বোম্বেতে ছিল।

এই সাতদিন সুনন্দা অচিন্ত্যবাবুর বাড়ীতেই ছিল। আমি অবশ্য সু-প্রকাশের বাড়ী চলে গিয়েছিলাম। আমার সঙ্গে যে ওর আর দেখা হয় নি তা নয়, তবে অচিন্ত্যবাবুর বাড়ীর ভীড়ের মধ্যে আমি ছিলাম নিতান্ত অপ্রয়োজনীয়। ট্রেনের কামরায় ছিলাম আমি আর সুনন্দা। যখন শুধুই সুনন্দা। কেউ শাড়ী কিনে দিচ্ছেন, কেউ গাড়ী করে বোম্বে শহর ঘুরিয়ে দেখাচ্ছেন। সুনন্দা হয়ে গেছে কারুর বোন কারুর বা মেয়ে। অচিন্ত্যবাবু ত তার নতুন মেয়ে সুনন্দাকে মা বলতে অজ্ঞান। সেখানে আমার স্থান আর

কোথায়? সৌজন্যের হাসিটুকুই বুঝি আমার প্রাপ্য। সুনন্দার কাছেও বুঝি আমি এখন মূল্যহীন; তবুও এই সাতদিন অচিন্ত্যবাবুর বাড়ী না গিয়ে পারিনি। রোজই আশা নিয়ে গিয়েছি, আর ফিরে নিজেকে একা মনে হয়েছে। ভীষণ একা। পরদিন আবার অচিন্ত্যবাবুর বাড়ী গিয়েছি।

সুনন্দার মামা খবর পেয়ে সুনন্দাকে ফিরিয়ে নিতে এলেন। তিনি দুদিন বোম্বে থেকে গেলেন। অচিন্ত্যবাবু কিছুতেই ছাড়লেন না। সেখানেই রইলেন। তাকেও সবাই বোম্বে শহর দেখিয়ে বেড়াল। আমার সঙ্গেও তাঁর পরিচয় হল। তিনি আমার কাজের জন্য আমার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। সবাই আমার খুব সুখ্যাতিও করলেন। কিন্তু আমার তাতে বুক ভরে উঠল না।

সুনন্দার যাবার দিন এসে গেল আমাকে বোম্বেতেই থাকতে হবে। ভিক্টোরিয়া টার্মিনাসে সেদিন ফিল্ম লাইনের অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। ভারত বিখ্যাত পরিচালক প্রণবেশ বাবুও সুনন্দার গল্প নিয়ে একটা ছবি তুলে ফেলতেও মনস্থ করলেন। সুনন্দাকে ঘিরে একটা ছোটো-খাটো ভীড় জমে গেল। আমি ভেবেছিলাম ষ্টেশনে যাবোই না। একটা দীর্ঘশ্বাস আমার বুকের মধ্যে দানা বেঁধে ছিল। পরে না গিয়ে পারলাম না। আমি ছিলাম সেই ছোটো খাটো ভীড়ের একেবারে পেছনের দিকে।

তারপর ট্রেন ছেড়ে দিল। সুনন্দা ট্রেনের কামরা থেকে হাত নাড়তে শুরু করল। এদিক থেকে আর সবাই। যন্ত্রচালিতের মত আমিও। এবার ট্রেনের কামরায় সুনন্দার সঙ্গে আমি নেই। ট্রেনটা দূরে হারিয়ে গেল। সুনন্দাও বুঝি আমার কাছ থেকে হারিয়ে গেল। চিরদিনের জন্য।

দর্পণে স্বপ্নের ছবি এবং যন্ত্রণা

কানাই ঘোষ

গত পঁচিশটা বছর ধ'রে যে স্বপ্নটা শান্তনু কতবার দেখেছে, নানা জনকে কতবার বলেছে সেই স্বপ্নটা, শান্তনুর জীবনের সর্বোত্তম লালিত সুখটা, সর্পাভ স্মৃতিটা, এই কিছুক্ষণ আগে ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। এইমাত্র বুড়ো রমজান মিস্ত্রি চোখের জলে বুক ভাসিয়ে বলে গেল—সাগর বেটিকে বাঁচান গেলনা বাবুজী—ওনারা বহুৎ চেষ্টা করলেন—লেকিন বিটি হামাদের ছেড়ে পালিয়ে গেল। পালিয়ে ও যাবে জানতাম,—লেকিন ইত্‌না জলদি গলা আটকে গেল রমজান মিস্ত্রার। গলা আটকে গেল শান্তনুরও। বুকের ভেতরে কোথায় যেন সহসা ঝড় বইতে আরম্ভ করলো—কত কথা, কত কান্না তোলপাড় করে ঠেলে উঠতে চাইল ওপরের দিকে—কিন্তু কিছুতেই একটা শব্দও উচ্চারণ করা গেল না। নীরবে মাথা নামিয়ে ইজিচেয়ারটায় পাথর হ'য়ে বসে রইল শান্তনু রায়।

সাগর। শান্তনুর সাগর-বৌ। সাগর বৌ-এর ভালবাসার লোক ছিল গর্জন। গর্জন শান্তনুরও এক টুকরো আনন্দের—উল্লাসের, একটুকরো উষ্ণ-স্মৃতির নাম। গর্জন ঠাকুর। খুব অল্প বয়েসে শান্তনুদের বাড়ীতে কাজ করতে এসেছিল—শান্তনুর জ্ঞানের বয়েস থেকেই ওর পার্শ্বচর, রক্ষক, শাসক, বন্ধু। গর্জনের স্থান বসু পরিবারের সবার খুব অন্তরঙ্গ আসনেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। দশবছর বয়েস থেকেই শান্তনু ওর কাছে লাঠি খেলা, কুস্তি, সাঁতার সাইকেল চড়া, গাছে চড়া শিখেছে—। শান্তনুকে গর্জন প্রাণ দিয়ে ভালবাসতো। তখনও সাগর আসেনি গর্জনের জীবনে। দশ বছরের কিশোর শান্তনু তার অবসরের অনেক মুহূর্তই বাইশ বছরের গর্জনের সান্নিধ্যে ব্যয় করতো।

মানুষ বড় অদ্ভুত। তা না হ'লে—দশ থেকে পনের এই পাঁচ পাঁচটা বছর গর্জনের হাতে গড়া শান্তনু,—গর্জনের শান্ত মহারাজ, গর্জনের সমস্ত আনন্দের, আহ্লাদের উৎস, কোথায় ভেসে গেল, সাগর এসে দাঁড়াতেই ওর জীবনে।

সেই দিনটার কথা শান্তনুর স্পষ্ট মনে আছে। এক মাসের ছুটি নিয়ে

গর্জন ঠাকুর সেবার দেশে গিয়েছিল। যাবার সময় শান্তনুকে ব'লে গিয়েছিল —মন খারাপ করবি না মহারাজ, হামি জলদি জলদি চ'লে আসবো। মেরা বাবুজীকা তবিয়ৎ আচ্ছা নেহি—উসি লিয়ে থোড়া দেখ্‌কে চলে আসবো। বহুৎ রোজ দেশে যাইনা।

এক মাসের জায়গায় প্রায় আড়াই মাস পার ক'রে ফিরে এলো গর্জন। ফিরে এলো বটে, তবে যে গর্জন গিয়েছিল সে গর্জন আর ফিরলো না। এ সম্পূর্ণ নতুন এক গর্জন ঠাকুর। মাথায় রঙিন জরিদার পাগড়ি রঙিন ধুতি মালকোচা দিয়ে পরা, রঙিন ধুতির ওপর ঘি-রঙের পাঞ্জাবি পরা গর্জনকে দূর থেকে অবাক চোখে অনেকক্ষণ ধরে সেদিন দেখেছিল শান্তনু। সবচেয়ে আশ্চর্য্য লেগেছিল ওর সঙ্গে প্রায় ছায়ার মত সন্তর্পণে, পায়ে পায়ে দাওয়ায় এসে দাঁড়ানো ছোট্ট শরীরের একগলা ঘোমটা টানা গর্জনের বৌকে দেখে।

শান্তনুকে হাতছানি দিয়ে কাছে ডেকেছিল গর্জন। আশ্চর্য্য এক সঙ্কোচ আর লজ্জায় লাল হ'য়ে উঠেছিল শান্তনু তখন—অথচ লজ্জা পাবার কথা গর্জনেরই। পায়ে পায়ে কাছে এসে অতি মৃদু গলায় জিজ্ঞেস করলো শান্তনু—

—তোমার বৌ বুঝি গর্জনদা।

হেসে মাথা নাড়লো গর্জন। শান্তনুর পিঠে একটা হাত রেখে তারপর কাছে টানলো ওকে। বললো,

হামকো উপর বহুৎ রাগ হুয়া মহারাজ? আরে, বদনসীব কা চক্কর মে গির গিয়া—যেসে গেলম পিতাজীকো দেখবার জন্তে—তা সবাই মিলে বিহা ক'রে দিল। তবে হাঁ,—কুন্তি বহুৎ আচ্ছা মেয়ে আছে।

—তোমার বউএর নামটা বিচ্ছিরি গর্জনদা। ও কুন্তি না, ও সাগর—গর্জনদার বউ একমাত্র সাগর ছাড়া মানায় না।

অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো গর্জন ঠাকুর। ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো শান্তনুর মা কুন্তির হাত ধরে। গর্জনের হাসি শুনে বললো,

—কি হোলো গর্জন।

—নমস্তে রানীমা। মহারাজ কী বলছে, শুনিয়ে।

—কি বলছে?

—বলছে, হামারা—এতক্ষণে লজ্জায় থেমে গেল গর্জন ঠাকুর। শান্তনুই কথাটা শেষ করেছিল তারপর,

—তুমিই বলো মা। গর্জনদার বউএর নাম কুন্তি কি মানায়, ওর নাম আমি দিলাম, সাগর। তাই শুনে গর্জনদা হাসছে।

মা তারিফের সুরে বললেন,

—চমৎকার নামটা কিন্তু দিয়েছে শান্তু। আজ থেকে আমরা তোর বৌকে সাগর বলেই ডাকবো।

সেই মুহূর্তে শান্তনু লক্ষ্য করেছিল,—যাকে নিয়ে এত হৈচৈ, হাসি তামাশা, সেই কুন্তি বা সাগর ঘোমটাটাকে আরও খানিকটা টেনে সামনে নামিয়ে মাথা নুইয়ে যেন মাটির মধ্যে মিশে যেতে চাইছে লজ্জায় আর সঙ্কোচে।

সেই থেকে সাগর। শান্তনুর মা ওকে ডাকতো কখনও সাগর, কখনও বৌ বলে—শান্তনুর সঙ্গে সাগরের দ্বিধা আর আড়ষ্টতার পর্দাটা উঠতে সময় লেগেছিল অনেকদিন। শান্তনু চিরদিনই একটু লাজুক প্রকৃতির—তার অপরিচিত মেয়েদের ব্যাপারে খুবই স্তিমিত। তাই গর্জনদার সঙ্গে কাজে অকাজে দিনরাত লেগে থাকলেও কিছুতেই ওদের সেই বিশাল বাগানের দক্ষিণকোণের ছোট্ট দারোয়ান ঘরটাতে পা উঠতো না—বারবার গর্জনদার আমন্ত্রণ, পীড়াপীড়ি এমন কি হাত ধ'রে টানাটানিতেও সাগরের সঙ্গে আলাপিত হ'তে অনেক সময় পার হ'য়ে গিয়েছিল। হয়তো অবস্থাটা এমনিই থেকে যেতো, কিন্তু সেই আশ্চর্য্য অঘটনটা কোথা থেকে উড়ে এসে ভাসিয়ে নিয়ে গেল শান্তনুর আর সাগরের মাঝখানের সঙ্কোচের পাহাড়টাকে। সেইদিনটাও এমনি মেঘে ঘোরঘোর দিন। শান্তনু সবে কোচিং ক্লাশ থেকে ফিরেছে, সামনে টেস্ট পরীক্ষা তাই দিনরাতের অনেকখানি সময় পড়া নিয়ে থাকতে হ'চ্ছে—গর্জনদার সঙ্গেও দিনের অনেকখানি সময় দেখা হয়না—অবশ্য বৌ আসবার পর মাস ছয়েকের মধ্যে, গর্জনদাও অনেকটা ঘরমুখো বা বৌমুখো হ'য়ে পড়েছে তখন—কাজকর্মের অবসরে কেবলই পালাই পালাই চিন্তা—তাই শান্তনুও তেমন লেগে থাকবার চেষ্টা করেনা। গর্জনদার পরিবর্তনে শান্তনু মনে মনে খুবই বিচলিত হ'য়ে থাকতো। হঠাৎ সেই গর্জনদা ছুটতে ছুটতে শান্তনুর সামনে এসে দাঁড়ালো, হাঁফাতে হাঁফাতে যা বললো তার সংক্ষিপ্ত মানে হোলো,

কুন্তি মানে সাগরবৌ জ্বরে বেহুঁশ। গর্জন বাড়ীর একটা কাজ নিয়ে বাইরে গিয়েছিল ফিরেছে এই কিছুক্ষণ হোলো,—সকালে কুন্তি ভালই ছিল—মনে হয়

দুপুর থেকে জ্বর এসেছে। শিগ্‌গিরই শান্তনু একবার ঘরে গিয়ে বসুক—ও ডাক্তার ডাকতে যাচ্ছে।

যেমন ঝড়ের মতো এসেছিল গর্জন তেমনি ঝড়ের মতই চলে গেল। বিধাগ্রস্ত শান্তনু তখন নিরুপায়ের মত পায়ে পায়ে গিয়ে উঠেছিল দারোয়ান ঘরটাতে। জ্বরের ঘোরে 'আঃ' 'উঃ' 'মা' ইত্যাদি অস্ফুটে বলছে সাগর আর এপাশ ওপাশ করছে কাঠের তক্তপোশটার ওপর। একটুকরো ঘরটাতে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত লোটা—বাটি, ঝাঁটা—লাঠি ইত্যাদি পড়ে রয়েছে। ঘরের ভেতরটায় কেমন ঘোরঘোর অন্ধকার। ওর উপস্থিতি সম্ভবতঃ অনুভব করলো সাগর। সামনের লোহার একটা হাতেল ভাঙা চেয়ার দেখিয়ে দিল হাতটা তুলে;—শান্তনু সেই প্রথম দেখলো, গর্জনদার বৌটা বেশ ফর্সা—এবং স্বাস্থ্যবতী।

শান্তনু কি ভেবে, সোজা এসে বসলো সাগরের গা ঘেঁষে ওর মাথার কাছটাতে—এবং নিজেরই অজান্তে বাঁ হাতটা রাখলো ওর তপ্ত কপালটাতে। এতটা মনে হয় বুঝতে বা আশা করতেও পারেনি সাগর। তাই শান্তনুর হাতটা কপালে লাগতেই কেমন শিহরিত শরীর নিয়ে একটু গুটিয়ে যেতে চেষ্টা করলো। ওর কপালে মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে শান্তনুর কি জানি কেবলই মনে হ'তে লাগলো, যে সাগরবৌ ওর খুব কাছের মানুষ—গর্জনদার চেয়েও কাছের—এতদিন এখানে না এসে ওর সাথে পরিচিত না হ'য়ে অন্যায়ই করেছে শান্তনু। খুব তাড়াতাড়িই ডাক্তার নিয়ে ফিরেছিল গর্জন ঠাকুর। তারপর চলেছিল টানা বাইশদিন ধ'রে জমে মানুষে টানাটানি। পড়াশুনা ছাড়া শান্তনুর সবটা সময় সাগর বৌ-এর সেবাযত্নেই কাটতে লাগলো। আর নিজেদেরই অজান্তে কখন যেন ওরা পরস্পরের অন্তরঙ্গতার দাওয়ায় এসে উঠেছিল। সাগর বৌ সেরে উঠলো, শান্তনুর টেস্ট পরীক্ষা শেষ হোলো,—গর্জন ঠাকুরের প্রতি রাগ-দুঃখটা কোথায় ভেসে গেল—। এক অজগাঁয়ের সরলা বিহারী বালিকা বধূর সঙ্গে বসুপরিবারের একমাত্র বংশধরটিকে তারপর থেকে ভবানীগঞ্জের রাস্তায় ঘাটে প্রান্তরে দেখা যেতে লাগলো—নিজেদের মনের আনন্দে নিজেরাই তখন ভেসে চলেছে। বেশ চলছিল দিন।

কিন্তু নীলমেঘের ভেতর থেকে বজ্রের মত নেমে এলো অকস্মাৎ এক নিষ্ঠুর আঘাত শান্তনু আর সাগর বৌএর মাঝে।

আর আঘাতটা এলো স্বয়ং গর্জন ঠাকুরের কাছ থেকে। আঘাতের আকস্মিকতায় আর নিষ্ঠুরতায় একেবারে পাংশু হ'য়ে গেল শান্তনু। প্রতিদিনের মত সেদিনও নদীতে স্নান করতে যাবার আগে ডাকতে গিয়েছিল শান্তনু, সাগরবৌকে। ঘরে ঢুকতেই দেখলো গম্ভীরমুখে বারান্দায় ব'সে আছে গর্জন ঠাকুর। শান্তনু সহজ চপলতায় বললো,

—কি হোলো গর্জনদা, বৌ বকেছে নাকি। মুখটা অন্ধকার কেন।

ভ্রূ কুঁচকে একবার ওর দিকে চাইল গর্জন, কোনো কথা না ব'লে। আরও কাছে এগিয়ে এলো শান্তনু। গর্জনের কাঁধে হাত রেখে এবার শুধোলো,

—ও গর্জনদা—কী হোলো কী তোমার। সাগর বৌ কোথায়।

—অন্দরমে। তারপর গলাটাকে অস্বাভাবিক গম্ভীর ক'রে বললো,

—মহারাজ, তুম্ আভি বড়া হ'চ্ছো. কুত্তি লড়কি আছে, আউর ও হামারা বৌ আছে—তোমরা এক সাথমে এত্না জাদা ঘুরফির করছো—ইধার উধার. যে, লোকজন,—হামার দেশোয়ালী আদমী সব খারাপ কথা বলছে। তাই,—কুত্তিকো হামনে বোল দিয়া,—কি আভিসে, হামাকে বলে তব্ ও বাহার যাবে। তুম আভি একেলা যাও মহারাজ—সানমে ও যাবে না।

প্রায় সমবয়সী সাগরবৌকে পেয়ে তার সরল সহজ স্নেহের পরশ পেয়ে অভিভূত হ'য়ে গিয়েছিল শান্তনু এতদিন—শান্তনুর বন্ধুবান্ধব প্রায় নেই বললেই হয়, তারপর বাইরে অনেক সময় কাটানোর অনুমতি শান্তনুর ছিল না, তাই অন্দরেই সাগরকে পেয়ে শান্তনুর কিশোর বয়েসের বান্ধব তৃষ্ণা মেটাবার আশায় মনটা যখন বাধাহীন বিহঙ্গের মত আকাশে উড়ছিল ঠিক তখনই তার একান্ত কাছের মানুষ,—তার মনকে একমাত্র যে অনেক ছোট থেকে জানে সেই গর্জনদার কাছ থেকে এলো এই আঘাত—সাগরবৌএর সাথে আর যখন তখন কথা বলা. খেলাকরা, ফুলপাড়া, স্নান করা যাবেনা—যেতে নেই—শান্তনু বড় হ'চ্ছে। এই প্রথম উপলব্ধি করলো শান্তনু যে ও বড় হ'য়েছে—ছোটবেলার স্বপ্নরাজ্য—স্বর্ণরাজ্য থেকে ও বিতাড়িত হ'য়ে এসে পড়েছে বড় হওয়ার অভিশপ্ত আঙিনায়। শুনতে পেল ঘরের ভেতরে ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদছে সাগরবৌ।

ফিরে এলো শান্তনু সেদিন। মনে আছে এরপর সাতদিন যায়নি ও গর্জনদার ঘরটার কাছে। দূর থেকে দেখেছে কখনও বাড়ীর অন্দরে গর্জনদার সঙ্গে ফুল তুলছে সাগরবৌ, কখনও বা খেয়ে দেয়ে থালাবাটি মাজছে কুয়োতলায়

বসে ব'সে আর গর্জনদা পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওকে সাহায্য ক'রছে। এমনকি সেজেগুজে কোথাও বেড়াতে যেতেও দেখেছে ওদের শান্তনু। তবে যতবারই চোখাচোখি হ'য়েছে সাগরবৌএর সঙ্গে—শান্তনু দেখেছে কী অব্যক্ত ব্যাথায় থিরথির করে কাঁপছে সাগরবৌএর চোখদুটো। তবুও শান্তনু একরকম ওকে এড়িয়েই চলতে লাগলো।

সপ্তাহখানেক পর গর্জনই এলো আবার শান্তনুর কাছে। ওর সহজ ভঙ্গিমায় বললো,

—শান্ত মহারাজ তু কী আছিস রে। ও-রোজ সে হামারা ঘরমে আউর গেলি না। তোমহারা সাগর বহুৎ গোস্সা করেছে। বলেছে মহারাজ বড়া আদমি আছে ও আমাদের মত এইসা গরীব নোকরকে পাশ আসবে কেনো—তা হামি ও না-বুঝ লেড়কি কো বকে দিলাম। বললাম কি, শান্ত মহারাজ আমাদের ওইসা নেহি—।

একটু থেমে আবার বললো,

—উস্ রোজ হামার ওসব কথা বলা অন্যায় হ'য়েসে মহারাজ—মাফ্ কর দো মুঝকো।

শান্তনুর মনের মধ্যে রঙিন ফুলঝুরিটা আবার ঝলমলিয়ে উঠলো। একমুখ হাসি নিয়ে গর্জনদার হাত ধরে এসে আবার দাঁড়ালো সাগর বৌ-এর সামনে। সাগর বৌ-এর কাছে পৌঁছে দিয়ে গর্জন ঠাকুর চলে গিয়েছিল আপন কর্তব্য কর্মে। শান্তনুদের অন্দরমহলে ওর ডাক পড়েছিল। সাগর ওকে হাত ধরে কাছে এনে বসিয়ে ছিল—আনন্দ চকচকে চোখে অনেকক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে থেকে বলেছিল—মহারাজ তু হামকো পেয়ার করতা? তুম হামাকে পেয়ার করো শান্তবাবু।

কথাটার মধ্যে কি ছিল কি জানি, লাজুক শান্তনু হঠাৎ লাল হ'য়ে উঠেছিল—আর তারপরই একেবারে আচম্বিতে সাগর বৌ ওকে জড়িয়ে ধরে একটা চুমু খেয়ে নিয়েছিল, অস্ফুটে বলেছিল,

—হামারা শান্ত মহারাজ।

ষোল বছরের শান্তনুর সেই প্রথম মনে হ'য়েছিল দুঃখ বলে পৃথিবীতে কিছু নেই—ওর চোখের সামনে ঘরবাড়ী গাছপালা, আকাশ-মাটি সব এক অনির্বচনীয় আনন্দ ধারায় ভেসে যেতে লাগলো। সাগর বৌ-এর হাতখানি

ধরে অনেকক্ষণ তারপর বিমূঢ় হ'য়ে বসে রইল শান্তনু। মনে মনে কেবলই বলতে লাগলো সত্যিই ও সাগরকে ভালবাসে, ভীষণ ভালবাসে।

গর্জনদাও খুব ভালবাসতো সাগরকে। ওই বলিষ্ঠ বীরদর্পী চেহারার মধ্যে কোথায় যেন লুকিয়ে রাখতো একটুকরো পেলব-প্রেমকে। সারাদিনের কাজ-কর্মের পর আদরে-আহ্লাদে অস্থির করে তুলতো ও সাগরকে। প্রায়ই দেখা যেত সাগরের কর্শা টলটলে গালটাতে দাঁতের কালশিটে নয়তো, ঠোঁটটার একটা কোনা একটু কেটে গেছে—আর মজার ব্যাপার শান্তনুকে সাগর সব বলতো খুটিয়ে খুটিয়ে। বলতো,

—হামারা এ গালমে থোড়া হাত বুলিয়ে দে তো মহারাজ।

অবাক হ'য়ে হয়তো জিজ্ঞেস করতো শান্তনু,

—কী হ'য়েছে সাগর বৌ।

কপট রাগে ফেটে পড়তো সাগর।

—ও শুওরটো কাল রাতমে হামারা এ্যাইসা হাল করদিয়া।

তু উস্‌কো থোড়া সমঝিয়ে দিস্ তো মহারাজ।

তারপর হাসতো ও, হাসিতে যোগ দিত শান্তনুও।

এমনি ভাবেই দিন যাচ্ছিল—পালকের মত হাল্কা, তুলোর মত নরম দিন। টানা দেড়টা বছর শান্তনু আর সাগর, সাগর আর গর্জন, গর্জন আর শান্তনু একে অপরকে নিয়ে, অপরকে পেয়ে মেতে ছিল। দেখতে দেখতে শান্তনুর স্কুল-ফাইন্যাল ফল বেরুলো—কলকাতার কলেজে গিয়ে পড়বার ব্যবস্থা হ'লো ওর। দেড় বছর প্রথম সাগরকে এবং জীবনে সেই প্রথম বাড়ী ছেড়ে মা-বাবা ছেড়ে শান্তনুকে বাইরে যাবার জন্যে তৈরী হ'তে হোলো। হৃদয়ের তন্ত্রী ছিঁড়ে বাঁধা হোলো ভবিষ্যতের বড় হওয়ার স্বপ্ন গ্রন্থখানি। চোখের জলের মধ্যে বিদ্যালয়ের পালা সেরে চলে এসেছিল শান্তনু কলকাতায়। আসবার সময় কী ভেবে, সাগর বৌ বলেছিল,

—তোমার একঠো ছবি হামকো দিয়ে যাবি মহারাজ। মনটা যখন খারাপ লাগবে দেখবো।

তারপর বিড়বিড়িয়ে বলেছিল, অকস্মাৎই,

—আমার সাথে আর ভেট হোবে না রে শান্ত। যামিতি সামনের মাহিনা দেশে যাচ্ছি।

—দেশে যাচ্ছো! কেনো সাগর বৌ?

—তোমার দাদাকো পুছো।

তারপর নিজেই বলেছিল,

—আমার বাচ্চা হোগা মহারাজ।

নিয়তির কি অমোঘ বিধান। সেদিন কলকাতায় আসবার সময় সাগর বউয়ের মুখনিঃসৃত কথাটুকু যে কী পরিমাণে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল তা হয়তো শান্তনু বুঝতে পারেনি, কিন্তু তা ফলেছিল অক্ষরে অক্ষরে।

কলকাতা থাকতে থাকতেই খবর পেয়েছিল শান্তনু যে কী একটা চুরির দায়ে দণ্ডিত হ'য়ে লজ্জায় ঘৃণায় চাকরী ছেড়ে চলে গিয়েছিল গর্জন ঠাকুর, দীর্ঘ চব্বিশ বছর পর বসুপরিবার থেকে। চোখ থেকে জন্মের মত সরে গেল গর্জন ঠাকুর—শান্তনুর আজন্মের অন্তরঙ্গ সাথী সহচর, দোসর, শান্তনুর চেয়ে বার তের বছর বয়েসের বড় গর্জনদা। সরে গেল সাগর বৌও। খবরটা পেয়ে অনেকক্ষণ —অনেকদিন মনখারাপ হ'য়েছিল শান্তনুর। কলেজে ক্লাশ করতে করতে কিংবা এখানে ওখানে বেড়াতে বেড়াতে মনে পড়তো, সাগর বৌকে—তার প্রলাপমধুর উপস্থিতির উষ্ণতাকে। মনে পড়তো গর্জনদার ভালবাসাকে স্নেহকে—মনটা তোলপাড় করে বেরিয়ে আসতে চাইতো—চোখ দিয়ে জল পড়তো।

সময়ই সব চেয়ে বড় সহায়। বছরের পর বছর গড়িয়ে গেল। বয়েস বাড়লো, জ্ঞান বাড়লো, অভিজ্ঞতা বাড়লো শান্তনুর। কচি কিশলয় আত্মপ্রকাশ করলো মহীরুহ হ'য়ে। গর্জন-সাগর অন্তর্ধানের পর টানা দশটা বছর পেরিয়ে গেছে। শান্তনু এখন পি-ডব্লু-ডির চীফ-ইঞ্জিনীয়ার শান্তনু বসু। জীবন এখন সময়কে বাহন করে চলে, অর্থই এখন জীবনের সর্বস্বধন। সাগর-গর্জন পর্ব স্মৃতিতে পলি পড়ে পড়ে এখন ধূসর হ'য়ে এসেছে এমনি সময় ঝড়ে ওড়া পাতার মতো কোথা থেকে উড়ে এলো সাগর বৌ পি-ডব্লু-ডির বৃদ্ধ রাজমিস্ত্রি রমজান মিঞার হাত ধরে।

রমজান মিঞাই সেদিন এসে শান্তনুর কাছে আর্জি নিয়ে দাঁড়ালো—বাবু অভয় দেন্ ত' একটা কথা বলি।

—বলো না।

—আপনার এখানকার কাজটাতে আরও কিছু লোকের দরকার বলছিলেন,

তা আমার মাথা মাল বইবার জন্তে একটা মেয়েকে যদি কাজ দেন। মেয়েটা বড় দুর্ভাগা, সাহেব।

মেয়েটাকে কাজে নেবার জন্তে রমজানের বকবকানি ভাল লাগছিল না, তাই তাড়াতাড়ি কথা চাপা দিয়ে শান্তনু বলেছিল,

—ঠিক আছে, তোমার যখন দরকার তখন নিয়ে নাও। তবে কাজটা টেম্পোরারি বলে নিও। পরে এখানকার কাজ সারা হ'লে সেবারের সেই লোকটার মত যেন 'আমাকে ছাড়বেন না বাবু' বলে পায়ে এসে পড়ে সিন ক্রিয়েট না করে।

দুঃখে গভীর চোখ নিয়ে রমজান, শান্তনুর পায়ের কাছে বসে পড়লো। একটু থেমে বললো,

—বোল সাব্, কুন্তি বেটি বর নাচার হ'য়েই একাজ করতে চাইছে। আগলামালে ওর বেটা আর মরদ দুদিনের ফারাকে মারা গেলো—ও অনেক চেষ্টা করলো—টাকা পয়সা সোনা দানা যা ছিল, সব দিয়ে চিকিৎসা করালো—লেকিন নসিব কোন্ রুখবে।

কে এক অজ্ঞাত কুন্তির দুঃখের কাহিনী শুনতে শুনতে বিরক্তিতে ভরা মন নিয়ে বললো, শান্তনু—

—কি হয়েছিল ওর ছেলে-স্বামীর।

—কলেরা। আমার দেশের ছেলে ওর স্বামী। বড় ভালো ছেলে। গত সপ্তাহে আমি দেশে গেলাম যখন—কুন্তি খুব কান্না করলো, বললো, চাচা, তুম্ হামকো পিতাজীকা দোস্ত, মেরা পিতাকি তরা, হামকো ইহাঁসে আপকে সাথ লে চলো, কুছ কামমে লাগাদো—নেহিত ম্যাই মর জাউ।

—ঠিক আছে, ঠিক আছে, কাল থেকে লাগিয়ে দাও।

এই মুহূর্তে শান্তনুর মনে হ'তে লাগলো—কেন রমজানকে ও সম্মতি দিয়ে ছিল। হয়তো ওর জন্তেই কুন্তি—ওর লাগর বৌ আজ সবাইকে ছেড়ে চিরজন্মের মতো চলে গেল। হয়তো ফিল্ডে ওকে দেখেই মাথা ঘুরে গিয়েছিল। তিন তলার সমান উঁচু বাঁশের পাল্লা বেয়ে ওঠার সময়—হয়তো গত দশ বছর আগে ফেলে আসা সেই সব দিনগুলো হুড়মুড়িয়ে এসে ওকে আনমনা করে দিয়েছিল।

হয়তো—। আর ভাবতে পারছে না শান্তনু—কিংবা হয়তো আর ভাবতে চাইছে না।

অসংলগ্ন রাগিনী

প্রবীর সাহা

ঠিকানা লেখা কাগজখানা হাতে নিয়ে শ্রীকান্ত বারকয়েক ভাবল। ছুটির দিনে—বাস ট্রামের ভীড় ভাল লাগে না—সপ্তাহের ছ'দিন ঠেলাঠেলি করে যেতে হয়; আবার এই ছুটির দিনেও তাই করতে হ'বে? অবশ্য ভীড় এড়ানো সেটাই কি আসল কথা? —কত বছর বাদে সে মিলিদের বাড়ীতে যাবে—যে মিলি একদা তার খেলার উৎসাহদাত্রী—তার প্রেরণা—সেই মিলি একদিন আকস্মিক ভাবেই হারিয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ সেদিন যদি পথে দেখা না হোত তা'হলে হয়ত এ জীবনে মিলির কথা সে একেবারেই ভুলে যেত। ভুলে যায়নি সে অবশ্য—তবে মিলির জন্য উন্মাদনা ধূসর হয়ে আসছিল—তাই বহুদিন বাদে দেখা হ'বার পর এই দ্বিতীয় সাক্ষাৎকার উচিত হবে কিনা সেটাই ভাবছে। এখনই এত ভাবনা বা চিন্তার কোন প্রয়োজন নেই। এখন সবে বেলা বারটা—বেরোলে সেই বিকেল বেলা—বাল্যকালের ঘটনাগুলো ছবির মত পরপর সাজানো হয়ে আছে তার মনের মধ্যে।

খানিকক্ষণ আগেই রমলা তৃতীয় কাপ চা দিতে এসে শ্রীকান্তর হাতে ঠিকানা লেখা কাগজটা দেখে রহস্য করে বলেছিল—'কিগো বাল্যকালের প্রেমের স্মৃতির ঘোর এখনও কাটেনি'?—'না, সে রকম কিছু না—তোমাকে বলেছি এর আগে আমাদের দুটো পরিবারের মধ্যে কী ভীষণ বন্ধুত্ব ছিল—ভাবছি এত বছর বাদে যাওয়া উচিত হ'বে কিনা—তুমি কি বলো? রমলা প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে চোখের কোনে বিদ্যুৎ কটাক্ষ তুলে চলে গিয়েছিল।

শ্রীকান্ত বুঝল রমলার অভিমান হয়েছে—মনে মনে বলল, 'রমলা তুমি জান না ভালোবাসার কাঙালপনায় কি অস্থির হ'তাম—এখন নিজেকে অনেক সংযত করেছি—কিন্তু, সেই ভালবাসা এত গভীরভাবে বুকের মধ্যে চেপে বসেছিল যে আজও কৈশোরের ফুটবল খেলার কথা মনে পড়ার সাথে সাথে মিলির কথা মনে পড়ে যায়। ইন্দ্রদের কোয়ার্টারের সামনের মাঠে বল খেলা হ'ত। সে খেলত সেন্টার ফরোয়ার্ডে। তখন তারা সবাই ক্লাস নাইনের ছাত্র আর মিলি ক্লাস সেভেনে পড়ত। ইন্দ্রের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব প্রচণ্ড গাঢ় ছিল—অথচ সেই ইন্দ্রের সঙ্গে ছাড়াছাড়ির পর আর দেখা হয়নি।

একদিন ম্যাচ খেলা হয়েছিল সেই মাঠে। অবশ্য ফ্রেণ্ডলি ম্যাচ্। ও যত বারই বল নিয়ে এগোয় তাকে চারদিক ঘিরে থাকে বিপক্ষ খেলোয়াড়েরা—ওদের মধ্যে সেই ছিল স্কোরার—কিছুতেই পাশ কাটাতে পারছে না। মাঠভর্তি দর্শক। সবাই তাকে উৎসাহ দিচ্ছে—অথচ সে কিছুতেই এগোতে পারছে না। একবার সে কোন রকমে গোল বক্সের কাছে বলটা ড্রপ করতে পেরেছে—সারা মাঠ তাকে বাহবা দিতে লাগল—হঠাৎ তার চোখে পড়ল—গোলপোষ্টের বাঁ দিকে একটা অল্পবয়সী মেয়ে, বেশ মিষ্টি চেহারা অন্যান্যদের সঙ্গে তাকে উৎসাহ দিচ্ছে। তার চোখ দু'টির দিকে তাকিয়ে সে যেন আলাদা কোন জগৎ আবিষ্কার করল। আগের থেকে সে আরও দুর্ধর্ষ গতিতে খেলতে থাকল—বিপক্ষদলের খেলোয়াড়দের বাহু ভেঙে চুরমার হ'তে থাকল—সে পেনাল্টিবক্সের সামনে বলটা ড্রপ করিয়ে হেড্ করে গোল দিল। সমস্ত মাঠ উচ্ছ্বাসে উদ্বেল হয়ে উঠল। এরপর সে আরও দু'টি গোল দিয়েছিল।

সেদিন খেলার পর ইন্দ্র বাড়ীতে নিয়ে গেল। ওর যাবার ইচ্ছে ছিল না—খেলার শেষে সেদিন খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা ছিল—অগত্যা ওদের বাড়ীতে যেতে হ'ল। ইন্দ্রের বাবা খুব উৎসাহী ভদ্রলোক। তিনি তাকে অনেক উপদেশ দিলেন—বল্লেন, খুব ভাল করে খেল বাবা—তুমি নিশ্চয়ই একদিন না একদিন বড় খেলোয়াড় হ'বে। সেদিন আসর বেশ ভালই জমেছিল। ইন্দ্রের বাবা বেশ আনন্দময় লোক। তার সামনে কেউ কখনও বিষাদ বা গম্ভীর হয়ে থাকতে পারবে না। আচ্ছা, উনি এখনও সেই হাসিহাসি মুখে থাকেন? মিলিও কেমন সদাহাস্যময় ছিল। ওর চোখ দু'টো দেখে মনে হত—সদাই হাসছে। রোগা চেহারায়—চোখ দু'টো বড় বড় আর কী ভীষণ গভীর। ওর চোখের দিকে তাকিয়ে থাকতে কি ভীষণ ভাল লাগত—কথা বলতে বলতে অন্যমনস্ক হয়ে তাকিয়ে থাকত, মাঝে মাঝে আশঙ্কা হত আর কেউ দেখে ফেলেনিত। কিন্তু মিলি ধরে ফেলল একদিন। সকলের আড়ালে তাকে ডেকে ধমকে দিল। সেদিন সন্ধ্যায় মিলিদের বাড়ী থেকে বেরিয়ে মাঠের বাইরের গেটের কাছে এসে দাঁড়াতেই—মিলি কোথায় যেন দাঁড়িয়েছিল—এ্যাই তুমি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাক কেন? আমার মুখে কি আছে? সে চমকে উঠেছিল—চারিদিকে চোখ বুলিয়ে দেখেছিল কেউ আছে কিনা—। তার সেই চোখের দিকে তাকিয়ে মন্ত্রমুগ্ধ হয়েছিল। ক্লাশ নাইনের ছাত্র—কিছু কিছু অপাঠ্য বই পড়া হয়েছে—গল্পের নায়কের মত গলায় হাল্কা আবেগ তুলে বলল, 'দেখি তোমার চোখ,

তোমার চোখের মধ্যে আমি যেন হারিয়ে যাই···সে শব্দপূরণ করার সময় পেল না, মিলি তার পিঠে কিল বসিয়ে দৌড় মিল।

বাড়ী ফিরে সেদিন অনাস্বাদিত যন্ত্রণা বুকের মধ্যে—আনন্দ আর সুখ, দুঃখ ও বেদনার মিলিত উচ্ছ্বাস—দাপাদাপি অস্থিরতা আর শূন্য হয়ে যাওয়া পৃথিবী-বোধ নিয়ে শ্রীকান্ত না পারল পড়তে, না পারল ভাল করে ঘুমোতে। আধো ঘুম আধো জাগা এই অবস্থায় সে একটা স্বপ্ন দেখল। সে যেন একটা বৃত্তের মধ্যে গোলক ধাঁধা পথ ধরে হাঁটছে। সে পথে মিলি হাততালি দিয়ে তাকে এগিয়ে যেতে বলছে। যত এগোচ্ছে পথ তত দূরে সরে যাচ্ছে—সে কিছুতেই মিলির কাছে পৌছাতে পারছে না। সেই পথে হঠাৎ অন্ধকার জমাট বেঁধে এল—বৃষ্টি নামল হুড়দাড়িয়ে—সে পথ হারিয়ে ফেলতে ফেলতে তার ঘুম ভেঙে গেল।

শ্রীকান্ত ঐ অল্প বয়সেই মোটামুটি কবিতা লিখতে পারত। সুকান্ত আর জীবনানন্দ তার কবি-প্রচেষ্টায় ধ্রুবতারা হয়ে আছে—আজও শ্রীকান্ত ওঁদের কবিতা পাঠ করে বুকের মধ্যে কেমন যেন অস্থিরতা অনুভব করে। শহর জীবনের কালিমা, ধূলি, ধোঁয়া, বঞ্চনা, দারিদ্র্য নিষ্ঠুরতা সব কিছুর মধ্যে আনন্দ সুখ ভালবাসা গলাগলি করে বাস করছে—অথচ মানুষ তার আসল বস্তুকে খোঁজার জন্য একটু পরিশ্রম করতে রাজী নয়। জীবনানন্দের বহুদেশ ঘুরে অন্বেষণ আর সুকান্তের বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়শীল সংগ্রাম কবিতার প্রতি তার ঐকান্তিক নিষ্ঠা এনে দিয়েছে। সেই ছোটবেলায় তাদের কবিতার অনুকরণে কবিতা লিখত, একবার তার একটা কবিতা স্কুলের ম্যাগাজিনে ছাপা হয়েছিল। —মাষ্টার মশায়েরা প্রশংসা করলেন। মনটা তার খুশীতে ভরপুর। ইন্দ্রদের বাড়ীতে সেদিন সে যখন পৌছাল ইন্দ্রের বাবা হাসিমুখে তাকে অভ্যর্থনা জানালেন—'তুমিত দেখছি একটা রত্ন বাবা—যেমন ফুটবল খেলায় তেমনি কবিতা লেখাতেও—তুমি কবিতা চর্চা ছেড়ো না—মিলি বলল, সত্যিই তুমি নিজে লিখেছ, না টুকলিফাই—বলে মিলি সশব্দে হেসে উঠল। শ্রীকান্তর মনটা ভীষণ দুর্বল—মিলির ঠাট্টায় সে ভারসাম্য বজায় রাখতে পারল না —উত্তেজিত হয়ে ছিটকে সে বাড়ীর ভেতরে ইন্দ্রের পড়ার ঘরে চলে গেল। মিলি বার কয়েক এল, ওকে শুনিয়ে শুনিয়ে দাদাকে আবোল তাবোল দু চারটা কথা বলে খুনসুটি ঝগড়া করল—সন্ধ্যা হয়ে গেছে, পড়ার সময় পেরিয়ে যাচ্ছে —শ্রীকান্ত উঠে পড়ল—ইন্দ্রদের কোয়ার্টারের দরজায় আধো অন্ধকারে

মিলি দাঁড়িয়ে আছে পথ আগলে—শ্রীকান্ত কোন কথা না বলে পাশ কাটিয়ে চলে আসার চেষ্টা করল। তোমার ত খুব রাগ দেখছি—আমার অন্যায় হয়ে গেছে—। মিলি ফিসফিস করে বলল। তার ফিসফিস কথা, গরম নিঃশ্বাস শ্রীকান্তর মুখের উপর পড়তে থাকল—শ্রীকান্ত কোন কথা না বলে চলে যাবার উদ্যোগ করতে মিলি তার জামা ধরে টান দিল। শ্রীকান্ত হুমড়ি খেয়ে মিলির গায়ের উপর পড়ল। শ্রীকান্তর বুকের মধ্যে শিরশিরানি ভয় সঙ্কোচ—কি যেন একটা ঘটতে চলেছে এই বোধ তার মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেতে লাগল। সে মিলিকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেল। মিলি কিছু বলল না তার মুখের নোনা স্পর্শে শ্রীকান্ত বুঝল মিলি থরথর করে কেঁপে উঠল। সে একরকম ছুটে বাড়ী ফিরল। অসহ্য আনন্দ সুখে সে ভাসতে থাকল। পরক্ষণেই তার ভীষণ ভয় মিলি যদি কাউকে বলে দেয়? সে কোন মুখে আর ঐ মাঠে বল খেলতে যাবে—সে বোধ হয় মিলিকে আর দেখতে পাবে না।

ভয়ে ক'দিন খেলতেই যায় নি। স্কুলে যথারীতি যাচ্ছে। ইন্দ্র মাঠে না যাওয়ার কারণ জিগ্যেস করায় ও একটা না একটা অজুহাত দেখায়। বিকেলে বাড়ী ফিরে খানিকক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে সময় কাটে না। মন খেলার মাঠের দিকে। কোন কোনদিন জোর করে পড়তে বসে। পড়াতে মন বসে না ইন্দ্রের পড়ার ঘরে তার মন আটকে থাকে। সে বয়সে ভালবাসা কি বস্তু সেটা জানার মত মানসিক গঠন না থাকলেও—একটা অদ্ভুত আকর্ষণে সারাদিন তার মন উন্মুখ হয়ে থাকত। মনের মধ্যে শঙ্কা, ভয় ভীড় করে, পদে পদে তাকে তাড়িয়ে বেড়ায়। সে যেন একটা বৃত্তের চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে—অথচ বৃত্তের কেন্দ্রবিন্দুতে সে কিছুতেই পৌঁছাতে পারছে না। সেই সময় তার মনের অবস্থার কথা চিন্তা করলে শ্রীকান্তর এখন হাসি লাগে। নিজেকে বিদ্রূপ করে—ছোট বয়সের ভালবাসা কোন রকম বোধের মধ্যে পড়ে না; অথচ সে কী ভীষণ বোকামীই না করেছিল—জলে যেমন দাগ পড়ে না—মিলির মনে কোন রকম দাগ পড়েনি—এখন সে'ত শুধু তার দাদার ছোটবেলার সহপাঠী বন্ধুমাত্র।

শ্রীকান্ত একদিন বৃষ্টিতে ভীষণ ভিজল। অসময়ের বৃষ্টি—সে জ্বরে পড়ল। পর পর চার-পাঁচ দিন স্কুলে যায়নি—ঘরের মধ্যে শুয়ে আছে—পড়ন্ত রোদের ঝিলমিল জানলা দিয়ে সে লক্ষ্য করছিল—সে শুনতে পেল ইন্দ্র মাকে জিগ্যেস করছে, 'শ্রীকান্ত বাড়ী আছে মাসীমা?' "হ্যাঁ বাবা খোকার ক'দিন জ্বর হয়েছে—আর

না হবেই বা কেন, কোন কথা শুনবে কি আমার—সর্দির ধাত তার ওপর সেদিন জলে ভিজল—তোমার সঙ্গে কে বাবা—তোমার বোন নাকি ?' 'হ্যাঁ মাসীমা আমার বোন' 'এলো ত মা তোমায় দেখি—বেশ মিষ্টি মুখ ত মেয়ের—তোমার নাম কি ?' 'ভাল নাম শ্যামলী, বাবা মিলি বলে ডাকেন।' 'বাঃ তাই নাকি ? এস তোমরা ঘরের ভেতরে এস।' লজাগ শ্রীকান্তর মনের মধ্যে ঢেউয়ের ওঠানামা চলছে—আঃ মিলি ইস্ত তোমরা কখন আসবে ঘরের মধ্যে—মিলি একবার এস।

'কিরে জ্বর বাধিয়ে বেশ শুয়ে আছিস।' শ্রীকান্ত উঠে সরে বসল। 'তোর জ্বর—ওদিকে যে ম্যাচ নিয়েছি—আসছে সপ্তাহে শনিবার—। 'ঠিক আছে তার আগেই ভাল হয়ে যাব।' মিলি চুপ করে দাদার পাশে দাঁড়িয়েছিল। শ্রীকান্ত লাজুক চোখে ওর দিকে তাকিয়ে বলল, 'বস', আরও অনেক কথাই তার গলার মধ্যে ভীড় করে এল—কোন কথাই সে বলতে পারল না।

মিলি নড়ে চড়ে বসল। পাকা গিন্নীর মত মুখখানা করে বলল, 'কত জ্বর—ঠিকমতন ওষুধ খাচ্ছত—বলেই সে শ্রীকান্তের হাতের উপর হাত রেখে জ্বরের পরীক্ষা করল। মিলি তোমার হাতখানা আরও কিছুক্ষণ না হয় রাখতে—কি ঠাণ্ডা আর নরম তোমার হাতের স্পর্শ—আমার জ্বর অর্ধেক সেরে গেছে—ঠিক মায়ের হাতের মতন তোমার স্পর্শ—খানিকক্ষণ গল্প করতে করতে মিলি বলল. 'জ্বরের' আগে কোথায় ছিলে। এক দিনও ত খেলতে যেতে দেখলাম না ?' শ্রীকান্ত মিথ্যা অজুহাত দিল। মনে মনে বলল এবার নিশ্চয়ই যাব। সন্ধ্যে হ'তেই ওরা চলে গেল। মিলি বলে গেল আবার আসবে।

রাত্রে সে শুনতে পেল মা বাবাকে বলছে 'খোকার বন্ধু আর তার বোন এসেছিল। বেশ মেয়েটি—কেমন মাসীমা মাসীমা করে কথা বলল—কাছে টেনে নেওয়ার মত স্বভাব—ধীর স্থির শান্ত মেয়ে—এতটুকু মেয়ে কেমন সংযত শিখেছে—ওরকম একটা মেয়ে যদি আমার থাকত।' 'তা. তোমার মেয়ে নেই এত আফশোষ যখন ওকেই খোকার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে মেয়ে বল মেয়ে, বউ বল বউ—করে আনি।' বাবা হাসতে হাসতে বললেন। মা মৃদুস্বরে কী বল্লেন বোঝা গেল না—শ্রীকান্ত জ্বরের প্রকোপে না উত্তেজনায় সে রাত ঘুমাতে পারল না। তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লেই সে দেখতে থাকল মিলির চন্দন চর্চিত মুখ, মাথায় টিকলি, কপালে গোলাপী টিপ. অধরে অর্ধোস্ফুট হাসি—তন্দ্রা ভেঙে গেলে আবার অস্থিরতা।

শ্রীকান্তর সঙ্কোচ দূর হলো। আবার নিয়মিতভাবে সে খেলার মাঠে এবং ইন্দ্রদের বাড়ী যেতে থাকল। মাঝে মাঝে তার খেলা এমন নীরস হয় যে বন্ধুরা রেগে ওঠে—খেলায় ঢিলেমি দেয়, বল নিয়ে ঠিকমতন চেজ্ করে না, ড্রিবলিঙ্ করে না—নেহাৎ খেলতে হয় তাই খেলে—আসলে মনটা তার তখন ফুটবলের মাঠে থাকত না—সারা মাঠে সে মিলিকে খুঁজে বেড়াত—মিলি তার বন্ধুদের নিয়ে মাঠের অন্তপ্রান্তে নিজেদের জগতে আবদ্ধ থাকত। তাদের কলকণ্ঠ তার মন আকর্ষণ করত—এক একদিন ত সে মাঠে খেলতেই নামত না—। আজ ভাল লাগছে না ভাই, বলে মাঠের একধারে বসে অন্যদের খেলা দেখত। ম্যাচ খেলার দিনেও তার খেলা তেমন জোরালো হ'ত না—যদি না মিলি সেই খেলার একজন দর্শক থাকত। এক এক দিন গোল করতে সে এত দেরী করত—আসলে তার মনে মনে গর্ব ছিল যে সে ছাড়া সেন্টার ফরোয়ার্ডে আর কেউই ভাল খেলতে পারে না—সে ভাবত আমি ইচ্ছে করেই গোল করছি না—সে চাইত তার সব ক'টি গোলই দর্শনীয় গোল হবে আর সেই সময় মাঠে মিলি উপস্থিত থাকবে—মিলির চোখের সামনে সে হিরো হয়ে উঠবে। ইন্দ্র একদিন বলেছিল— তুমি খুব ভাল খেল—অথচ একদিন গোল দিতে খুব দেরী কর—যেন মনে হয় পাশ কাটিয়ে বল নিয়ে এগোতে পারছ না—আবার কখনও দেখি সারামাঠে তুমি একাই বল নিয়ে ছুটছ—মিলি দাদার কথায় সায় দিয়েছিল 'তুই ঠিকই বলেছিস দাদা।' উত্তরে শ্রীকান্ত মৃদু হেসেছিল—মনে তার অনেক কথাই জমেছিল—বারবার একটা কথাই সে বলতে চেয়েছে—সে'ও তোমার জন্য।

সেবার দল বেঁধে বোটানিক্যাল গার্ডেনে পিকনিক করতে গিয়েছিল। ইন্দ্রের বাবা তাদের সঙ্গে ছিলেন। শ্রীকান্তর বেড়াতে আসা বাড়ীর বাইরে বাড়ীর লোক ছাড়া এই প্রথম। স্বাধীনতার আনন্দে মন ভীষণ খুশীতে ভরপুর হয়ে ওঠে। আনন্দের হাটের মাঝে শ্রীকান্ত প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছিল। মিলি সকলের সঙ্গে হেসে লুটোপাটি খাচ্ছে। তার অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে তার ঝগড়া খুনখুটি হাসি উচ্ছ্বাস দেখে তার মনে মনে রাগ হ'তে লাগল। রান্না হ'চ্ছিল—সবাই দল বেঁধে কাঠ আনল—জলের ব্যবস্থা হোল—শ্রীকান্ত তার বিষণ্ণ মনের ভার লাঘব করার জন্য—গঙ্গার ধারে গিয়ে বসল। জল পুলিশের লঞ্চটি কেমন তরতর করে এগিয়ে যাচ্ছে। ওপারে খিদিরপুরের কলকারখানার কর্মব্যস্ততা বোঝা যাচ্ছে। ক'একটা জেলে নৌকা ঘুরপাক খাচ্ছে। ঢেউয়ের

ওঠানামা দেখতে দেখতে সে তন্ময় হয়ে পড়েছিল। সে মনে মনে তার অন্য বন্ধুদের ঈর্ষা করেছিল—মিলি তাদের সঙ্গে হেসে হেসে কেমন কথা বলছে—আসলে তার তখন মনের অবস্থা এমন যে সে চাইত মিলি শুধু তার সঙ্গে কথা বলবে। পিঠে আলতো স্পর্শ লাগতে সে চমকে উঠেছিল। অদ্ভুত শিরশিরানি তার মেরুদণ্ড বেয়ে নামতে থাকল। ঘাড় না ঘুরিয়েই সে বুঝতে পারল. মিলি। সবাইকে ছেড়ে একা একা কী হচ্ছে কবি? মিলি ওকে কবি বলে ডাকত মাঝে মাঝে। শ্রীকান্ত চুপ করে বসে রইল। মিলি ওকে ধাক্কা দিয়ে বলল, 'কি, হোল কি কথা বল না।' তার অভিমানের কণ্ঠস্বর শুনে শ্রীকান্তর বুকের মধ্যে অদ্ভুত ভাললাগা জেগে উঠল। সোনালী রোদ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। মিলি তার পাশে বসল। শ্রীকান্ত নড়েচড়ে বসল। কাছে কতকগুলি ফড়িং উড়ে বেড়াচ্ছিল। 'দেখ, দেখ ফড়িং—এস না ধরি একটা'—মিলি বলে উঠল। শ্রীকান্ত বাধা দিতে চাইল 'যাক না, ওগুলিকে ধরে কষ্ট দিয়ে লাভ কি? মিলি ফড়িং-এর পেছনে ছুটতে শুরু করল। অগত্যা শ্রীকান্তকেও একটু চেষ্টা করতে হোল। লাফ দিয়ে ফড়িংটাকে ধরে মিলির হাতে দিল। মিলির সেটার ডুপাশের ডানার পাশ দিয়ে আঙুল চালিয়ে পেটটা সযত্নে টিপে ধরে রইল। ফড়িংটার চোখের দিকে তাকিয়ে শ্রীকান্তর মনটা কেমন যেন অস্থির হ'য়ে উঠল। অসহায় যন্ত্রণাকাতর মূক ফড়িং প্রতিবাদ করতে পারছে না—ফড়িংটাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মিলি দেখতে থাকল। 'এঃ মরে গেছে'—বলে মিলি সেটাকে ফেলে দেবার সঙ্গে সঙ্গে—একটা কাক মুখে করে উড়ল। শ্রীকান্তর পিঠে কিল মেরে মিলি দৌড়াতে শুরু করল। ফড়িংএর ঘটনা শ্রীকান্ত সঙ্গে সঙ্গে ভুলে গেল—মিলির পেছনে সে দৌড়াতে থাকল—বড় বটগাছটার চৌহদ্দির মধ্যে ঢুকে একটার পর একটা ঝুরি ধরে তাদের লুকোচুরী খেলা চলল কিছুক্ষণ। 'চল মিলি বাড়ীর সবাই খুঁজবে', ওরা ফিরল। এসে দেখে একটা সুন্দর আসর বসেছে। ইন্দ্র গান গাইছে—সুমন তাদের আর একজন বন্ধু—থালা বাজিয়ে সঙ্গত করছে। আসরের মধ্যে বসতেই—মিলিকেও গান গাইতে হোল। মিলির মা গান গাইতে জানেন—তাই মেয়েকেও যত্ন করে শিখিয়েছেন—মিলির গলাটা বেশ মিষ্টি। এরপর শ্রীকান্ত আবৃত্তি করল। সবাই হাততালি দিল—সেদিন বেশ জমেছিল। সকলেই সেদিনের আনন্দ উপভোগ করেছিল। শ্রীকান্ত বিড়বিড় করে উঠল—ছোটবেলাটা বড় অদ্ভুত। এমন বাজে ভাবে কাটে—কি কষ্টই না পেতাম তখন—এখনও অবশ্য বেশ কষ্টের মধ্যে আছি—

কিন্তু এই দুটো কষ্টের বড় আকার আলাদা। ঐ কষ্টটার মধ্যেই কী আনন্দই না থাকত। একদিন মিলির দেখা না পেলে খেলা ত নষ্ট হ'তই—পড়াও নষ্ট হোত। স্কুলে পড়া না পারার জন্য তাকে কতদিন বকুনি খেতে হয়েছে—অথচ লেখাপড়ায় সে তেমন খারাপ ছিল না।

সেই সময় মিলির সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা আরও বেড়ে গেল মিলির জন্মদিন উপলক্ষ্যে। পরীক্ষার মাসখানেক আগে। তখন বাড়ীতে বেশীর ভাগ সময়েই আটকে থাকত—বাবা ছিলেন কড়া ধাতের মানুষ পড়ালেখায় শিথিলতা মোটেই পছন্দ করতেন না—তাছাড়া—ইন্দ্র লেখাপড়ায় খুব ভাল ছেলে। মিলি প্রতি-বছর ফার্ষ্ট হয়। সে যদি খুব সাধারণভাবে পাশ করে তাহলে ওদের কাছে মুখ দেখাবে কি করে। পড়ায় কি আর মন বসত—মন বারবার ইন্দ্রের বাড়ীতে ছুটে যেত। মনটাকে জোর করে পড়ার বইয়ে আটকে রাখে—একদিন মিলি আর ইন্দ্র তাদের বাড়ীতে এল তাকে নিমন্ত্রণ করতে—মিলির জন্মদিনে। 'এ্যাই, অত পড়ে কি হবে—তুমিই ফার্ষ্ট হ'বে—সেটা বুঝতে পারছি—তবে কাল আমার জন্মদিন—মা তোমায় যেতে বলেছে।' বলে মিলি মায়ের কাছে চলে গেল—সে আর ইন্দ্র সে'দিন পরীক্ষায় কী হবে আর কি কি প্রশ্ন সে জানতে পেরেছে—সেইসব কথা আলাপ করতে থাকল।

জন্মদিনের আসর তেমন জমল না—অন্য সকলের কাছে ভাল লাগলেও শ্রীকান্তর মনটা বিরক্তিতে ঈর্ষায় বিষাদ হয়ে গেল। 'এই যে শ্রীকান্তদা এসেছ তাহলে—বস, দাদাকে ডেকে দিচ্ছি।' কলহাসিতে মুখর হয়ে বন্ধুদের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কখনও বা গল্প শোনা গেল, 'এই গল্প শোন, তোকে না একটা মজার কথা বলব ভাই।' 'এই মিলি ভাল হ'বে না বলছি,—কি এমন সেজেছি বাবা, তোমরা ত আমার চেয়েও বেশী সেজেছ।' কিংবা, 'কি বললি আমায় পরীর মত লাগছে—দেনা ভাই দু'টা ডানা লাগিয়ে।' সে ছাড়া ইন্দ্রের আর কোন বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করা হয়নি। ইন্দ্রের সঙ্গে ক্যারম খেলছিল—বারবারই অন্যমনস্ক ষ্ট্রাইকার ঘুঁটিগুলোকে পকেট করতে পারল না—সে হেরে যেতে থাকল। খাবার সময়েও মিলি বন্ধুদের সঙ্গে মেতে রইল—স্কুলের কথা, দিদিমণিদের কথা—দাদার পেছুলাগার কথা, জন্মদিনে বাবা কি দিয়েছেন—সেই সব কথা—অথচ ওর দিকে ভাল করে তাকাচ্ছেও না বা কথাও বলছে না। ইন্দ্রের মা ওকে খুব যত্ন করে খাওয়ালেন—মিলির বন্ধুদের মধ্যে

কে একজন 'কচি খোকা' বলতেই ওর বন্ধুরা হিঃহিঃ করে হেসে উঠল। লজ্জায় ক্রোধে ওর কান দুটো গরম হয়ে উঠল।

খাওয়ার শেষে ও চলে যাবার আগে মিলির জন্য আনা ফাউন্টেন পেনটা টেবিলের উপর সাবধানে রেখে বলল 'ইন্দ্র চলিরে ভাই—মাসীমা যাচ্ছি'—মনটা বিরক্তিতে ও ক্রোধে অস্থির হয়েছিল—সে দ্রুত দরজার বাইরে এসে হনহন করে এগিয়ে চলল, পেছন থেকে কে যেন তার হাতটা ধরে টানল। সমস্ত শরীরে সে যেন কিসের একটা নাড়া খেল। থমকে দাঁড়িয়ে রুদ্ধস্বরে বলল, 'ছাড়ো, বাড়ী যাই। 'যাও না, আমি কি ধরে রেখেছি? আচ্ছা বলত আজ কেমন লেগেছে'—'ভাল' মুখ ঘুরিয়ে জবাব দিল।

মিলি তাতেও নিরস্ত না হয়ে বলল, 'এত রাগ কিসের, আজ আমার জন্মদিন—আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতে পারবে না।' মিলির বলার ভঙ্গিমায় শ্রীকান্তর মনের ভার অনেকটা লাঘব হয়ে গেল—সে শুধু বলল, আজ যাই রাত হয়ে যাচ্ছে—বেশী রাত করলে বাবা বকবেন। সেদিন সে যেন পায়ে হেঁটে বাড়ী আসেনি—সে প্রায় উড়ে উড়ে বাড়ী এসেছে। সন্ধ্যার বিস্বাদ মন সুখময় আনন্দে ভাসতে থাকল—আনন্দের কি অপরূপ স্বাদ। সমস্ত রাত সে একটা নিটোল ঘুম দিল। তার সেই স্বপ্নের বিরাট বৃত্তটা ক্রমশঃ ছোট হয়ে আসতে আসতে একটা ফুটবলের মাঠ হয়ে গেল—সারা মাঠে সে বল পায়ে ছুটছে দুর্ধর্ষ গতিতে। বলের গতিতে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে—কলকাতা ফুটবল জগতে সে এক চমকপ্রদ কিংবদন্তী। ঘুম ভেঙে যেতে তার মন বিরক্তিতে ভরে উঠল—উঠতে ইচ্ছে করছিল না—সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল—কদিন বাদেই পরীক্ষা।

পুরানো কথা শ্রীকান্তর বেশ মনে পড়ে যাচ্ছে—তখনকার অবস্থার কথা ভাবলেও এখন বেশ হাসি লাগে, অথচ আর একদিন বল খেলার মাঠে তার সমস্ত ভাগ্য নির্ধারণ হয়ে যাবে—একথা কে ভাবতে পেরেছিল—কোথায় বা সেই ফুটবলার হওয়ার স্বপ্ন। সব কিছু ভেঙে তছনছ হয়ে গেল—কিছুদিন ধরেই সে লক্ষ্য করছিল বন্ধুরা তাকে ঈর্ষা করে—মাঝে মাঝে মিলির নাম জড়িয়ে তাকে অপ্রস্তুত করার চেষ্টা করে।

মিলি ভীষণ ছটফটে আর চঞ্চল প্রকৃতির মেয়ে—সে কখনও তাদের খেলার মাঠে এসে শ্রীকান্ত বা ইন্দ্র বা আর অন্য কোন ছেলের হাত ধরে বলত, এ্যাই

গাছ থেকে ফুল পেড়ে দাও বা পেয়ারাগুলো গাছে বেশ উঁচু মগডালে ঝুলছে, পাড়তে পারছি না—তুমি পেড়ে দাও—ইন্দ্র রেগে যেত, শ্রীকান্ত লাজুক স্বভাবের ছেলে তার পক্ষে এসব সম্ভব নয়—অন্য বন্ধুরা পরম উৎসাহে তার ঐ সব হুকুম তামিল করত, অথচ খেলার মাঠে বা ইন্দ্রদের বাড়ীতে শ্রীকান্তর অপ্রতিহত গতি দেখে তারা মনঃক্ষুণ্ণ হোত। বন্ধুরা মাঝে মাঝে নিজেদের মধ্যে কী সব আলোচনা করত আর তাকে দেখে মুখ টিপে হাসত। স্বভাব-ভীরু এবং লাজুক স্বভাবের ছেলে শ্রীকান্ত বুঝতে পারত সেই ওদের আলোচনার উৎস। কিন্তু প্রতিবাদ করতে গেলেই যদি অপ্রিয় কিছু শুনতে হয় এই ভয়ে সে ওদের এড়িয়ে চলার চেষ্টা করত।

ইতিমধ্যে ইণ্টার স্কুল নক আউট ফুটবল খেলা জমে উঠেছে। তাদের স্কুল আর জেলা স্কুল ফাইন্যালে খেলার আসরে মুখোমুখী। যে দল জিতবে সেই স্কুল সেবার চ্যাম্পিয়ান হবে। ইতিপূর্বে চ্যাম্পিয়ান ছিল জেলা স্কুল। মাষ্টার মশায়রা তার পিঠ চাপড়ে উৎসাহ দিয়েছেন। বলেছেন 'মনে রেখ তোমাদের উপর স্কুলের সুনাম নির্ভর করছে।' সেদিন দর্শকের ভীড়ে মাঠ জমজমাট। মিলি, মিলির বাবা মাঠের একধারে সামনের সারিতে বসে আছে। সারা মাঠে প্রচণ্ড উত্তেজনা। হাফ টাইমের আগে কোন পক্ষই কোন গোল করতে পারেনি। দুপক্ষই সমান গতিতে বল আটকাচ্ছে। শ্রীকান্ত সেদিন প্রচণ্ড খেটে খেলছে। মরিয়া হয়ে বল নিয়ে এগোচ্ছে—কিন্তু প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়রা তাকে চারিদিক থেকে সাঁড়াশীর মত আটকে রেখেছে। সে মাঝে মাঝে দেখছে মিলি কেমন অস্থির হয়ে উঠছে। খেলা শেষের আর পাঁচ মিনিট বাকী। ও অনেক কষ্টে একটা বল নিয়ে সমস্ত বাধা কাটিয়ে এগিয়ে চলেছে—এবারে তাকে গোল দিতেই হ'বে, তা না হলে সে তার মুখ দেখাবে কি করে—ছুটতে ছুটতে হাফ লাইন থেকে বল নিয়ে পেনাল্টি বক্সের ডান ধারের কর্ণারে বলটা ডান পায়ে চেপে বাঁ পায়ে সজোরে কিক দিল। বলটা বুলেটের মত ছিটকে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার তলপেটে কে যেন বুটসুদ্ধ লাথি মেরেছে। সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলার আগে গোলসূচক বাঁশি শুনতে পেল। তার চোখের সামনে দর্শকদের উল্লাস খেলার মাঠ সমস্ত অন্ধকার হ'য়ে গেল।

জ্ঞান ফিরতে সে দেখল মা দাঁড়িয়ে আছে পাশে। মায়ের চোখে জল—তিনি বিড়বিড় করে ইষ্টদেবতার নাম স্মরণ করছেন। সে বুঝতে পারল সে হাসপাতালে শুয়ে আছে। চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখল, মাষ্টার-মশায়'রা,

বন্ধুরা ও ইন্দ্র, একধারে উৎকণ্ঠা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মিলি আর একটু দূরে তার বাবার হাত ধরে দাঁড়িয়ে—তার চোখে জল—তাকে তাকাতে দেখে সে মৃদু হাসল। হাসি মেশান কান্না তার কাছে বড় অদ্ভুত মনে হোল।

প্রায় এক সপ্তাহ তাকে হাসপাতালে থাকতে হোল। সে ছাড়া পেল, কিন্তু সে সুস্থ হয়ে উঠতে পারল না—বাড়ীতে কিছুদিন চিকিৎসা করতে হ'বে আর খাওয়া দাওয়া নিয়মমাফিক করতে হবে। পেটের উপর কোনরকম চাপ দেওয়া চলবে না। সে বুঝতে পারল—সে আর খেলতে পারবে না। ইন্দ্র আর মিলি প্রতিদিন তাকে দেখতে আসত। তাকে কাঁদতে দেখে মিলি বলত, ব্যাটা ছেলে কাঁদে না। তুমি ত খেলোয়াড়—দেখো আবার ভাল হয়ে উঠবে—আবার বল খেলবে। ইন্দ্র বলত, আসছে সিজনে তুই আবার খেলবি। তোর বেষ্ট স্কোরারের পদকটি দেখেছিস? সবাই তোর খেলার প্রশংসা করছিল। এই সব সান্ত্বনাবাক্য শুনেও তার মন প্রবোধ মানত না। সে বুঝতে পারত তার খেলোয়াড় হওয়া হয়ে উঠল না।

সেই ব্যথাটা সেরে গেলেও এখনও মাঝে মাঝে ব্যথার জায়গায় হাত দিলে তার মনটা চিনচিন করে ওঠে আর সেই কিশোর কালের ভালবাসার কথা মনে পড়ে যায়—সে যেন সেই খেলার মাঠে একাই বল পায়ে ছুটছে—মিলি হাততালি দিচ্ছে—আরও জোরে আরও জোরে-----

কোন কোনদিন মিলি আসত। সে প্রতিদিন উন্মুখ প্রতীক্ষায় সময়ের হিসেব করত। যতক্ষণ মিলি থাকত তার যন্ত্রণাবোধ কমে যেত—সে স্বপ্ন দেখত, জাগরণে ঘুমে। বড় হয়ে সে চাকরী করবে আর মিলি···শেষ পর্যন্ত ভাবতেই ভয় লাগত—না জানি কোন নিষেধের বেড়াজাল আটকে রাখে।

একদিন মিলি এসে জানাল তার বাবা বদলী হয়ে যাচ্ছেন ধানবাদে। তিনি প্রমোশন পেয়েছেন তাদের যেতে হ'বে। শ্রীকান্ত বুকের মধ্যে একটা যন্ত্রণা অনুভব করল। সে বহুকষ্টে তার চোখের জল রোধ করতে পেরেছিল। সে ভাবতেই পারে নি—এত তাড়াতাড়ি বিচ্ছেদ এসে যাবে। মিলি সান্ত্বনা দিত, ইন্দ্র আসত—সকলেরই মনে বিচ্ছেদের করুণ বাঁশি বেজে উঠত। অবশেষে সেই প্রতীক্ষিত দিন এল। মিলি যাবার দিন তার সঙ্গে দেখা করে গেল। শ্রীকান্তকে প্রণাম করে বসল আকস্মিকভাবে। শ্রীকান্ত বাধা দিতে গিয়ে থমকে গেল—মিলি কান্নায় ভেঙে পড়ছে। শ্রীকান্ত মিলির মাথায় হাত বুলিয়ে দিল—

বলল, 'এই বোকা মেয়ে কাঁদে না—আমাদের আবার দেখা হবে—চিঠিপত্র দিয়ো।' মিলি চলে গেল। ঠিকানা ইন্দ্র বা মিলি জানত না। ইন্দ্র বলেছিল গিয়েই ঠিকানা লিখে চিঠি দেবে।

প্রথম প্রথম দু'একটা চিঠি আসত—তারপর কালক্রমে চিঠি বন্ধ হয়ে গেল। শ্রীকান্তর বাবাও কলকাতা থেকে দূরে মফঃস্বলের দিকে ছোট বাড়ী করলেন আর সে তখন স্কুল ছেড়ে দিয়ে কলেজে পড়ছে—কাজের চাকায় সময় থেমে থাকেনি—ব্যথা আস্তে আস্তে ফিকে হয়ে গেছে—এবং যথারীতি মিলিদের ঠিকানা সে হারিয়ে ফেলেছে।

অথচ মিলি বলেছিল সে ভুলে যাবে না। মিলির বাবার বদলী হওয়ার কথা তার কাছে বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত মনে হয়েছিল। সে সেদিন মিলির দিকে বহুক্ষণ তাকাতে পারেনি। একটা অভিমান তার বুকের মধ্যে মাথা কুটে মরছিল। সেদিন সে আবেগে অস্থির হয়ে মিলিকে জড়িয়ে ধরে ফিস্‌ফিস্ করে বলেছিল 'আমায় ভুলে যাবে না ত?' মিলির দু'চোখে জল চিকচিক করে উঠেছিল দুজনে দীর্ঘক্ষণ কথা বলতে পারেনি—

অথচ সেই মিলির সাথে দীর্ঘদিন বাদে দেখা। সে কিন্তু আগের মত সেই অনুরাগ বা উত্তেজনা অনুভব করেনি। তবে একটা ব্যথা চিনচিন করে উঠেছিল তার বুকের মধ্যে। তার বাল্যকালের ভালবাসাকে সে সংগোপনে বুকের মধ্যে পাহারা দিচ্ছে। সেই কাঠুরিয়ার মত জলের মধ্যে হারিয়ে যাওয়া তার লোহার কুঠারের জন্য প্রার্থনা করতে পারবে না। কাঠুরিয়া বেচারা কুঠার ফেরত পেয়ে খুব খুশী হয়েছিল—কিন্তু আজ সেই ভালবাসা ফিরে পেয়ে সে কি খুশী হ'তে পারবে।

বিষণ্ণ প্রহরী

মদন দাস

প্রত্যহ কিছু কিছু বিষণ্ণতা জমে বুকের মধ্যে। এভাবে কিছুকাল অতিক্রান্ত হ'লে একদিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে তার মনে হয় সে একটা মৃত সত্তা, বহুদিন যাবৎ পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াচ্ছে অহেতুক। সেদিন তার আর কিছুই করতে ইচ্ছা যায় না, বিছানায় পড়ে থাকে, রোদ ওঠে, বেলা বাড়ে। বাড়ীর বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন শব্দ শোনে সে—যেন কতদূর থেকে। কখনো মা এসে ডেকে যায়—সে সাড়া দেয়না। কখনো ছোট ভাইপো-ভাইঝি, আরও পরে বৌদি ডাকে—বাজারের কথা বলে—সে সাড়া দেয়না। বুঝতে পারে দাদা গজ্‌গজ্‌ করতে করতে বাজারে গেল, কিংবা হয়তো গলা তুলে চেঁচালো—আলু ভাতে ভাত রাঁধো, তাই গিলে অফিস যাই····কিন্তু সে চুপচাপ পড়ে থাকে দরোজা বন্ধ ঘরে আধো অন্ধকারে। বুকের মধ্যে তার কোথায় যেন চুঁইয়ে চুঁইয়ে জল পড়ার মতো কিছু একটা অনুভূতি—সেই অনুভূতিটা কখন ক্রমশ: চোখের কোলে উঠে আসে, তখন তার খুব কান্না পায়····।

এভাবে দুপুর এগিয়ে এলে আজ মা ডাকাডাকি করছিলেন, তারপর দরোজায় ধাক্কাধাক্কি, অনেকক্ষণ এভাবে, তারপর মায়ের মৃদু কান্নার শব্দ···· সব শুনতে পাচ্ছিল সে···দূরাগত ধ্বনি সব···সে নিঃসাড়ে পড়েছিল।

কপালের দুপাশে মাঝে মাঝে এখনও দপ্‌দপ্‌ করছিল, যদিও গতকাল রাতের তুলনায় এটা কিছুই নয়। জিভটা শুকনো—একটু জল খেতে ইচ্ছা হ'লো তার কিন্তু···।

একটু ড্রিঙ্ক করলেই তার মাথায় এরকম যন্ত্রণা হয়, আর সমস্ত শরীর জুড়ে গভীর অবসাদ, অসহ কষ্ট। সে জানে, সেজন্য এই কষ্টের জন্যই সে কখনও কখনও মদ খায়। গতকাল দু'জন মানুষ তার মাথায় দু'টো পেরেক মেরেছিল—একটা বৌবাজারের মোড়ে সেই ভিখিরি, আর একটা আনন্দ—তার বন্ধু। এই মুহূর্তে দুটো মুখই মনে পড়ল তার-একটু অসহায় হাসল। কোন মানে হয় না, মনে মনে বলল, এটা কি রাগ? ঈর্ষা? আক্রোশ····কিন্তু গতকাল সন্ধ্যায় কি একটা তার বুকের ওপর চেপেছিল—নিজেকে নষ্ট করার মতো ইচ্ছা····। তারপর সেই মেয়েটি—সে কোথা থেকে এলো হঠাৎ, ছিন্নভিন্ন করে দিল তার সমস্ত বোধ বিশ্বাস···।

গতকাল :

টাকা পয়সার খুব অভাব পড়লে মাঝে মাঝে সে বই বিক্রি করে। তার বাবা ছিলেন ল-ইয়ার। বই কেনা আর জার্ণাল বাঁধিয়ে পাহাড় করা তার সখ ছিল। বৈঠকখানা আর পাশের ঘরটি বই ঠাস বোঝাই। কলেজ স্ট্রীটে সে খুঁজে খুঁজে একটা দোকান বার করেছে যারা এই বইগুলির জন্য ভালো দাম দেয়। প্রথম প্রথম এই ব্যাপারটা তাকে যথেষ্ট মানসিক অশান্তি দিতো—কেমন একটা পাপবোধ। এখন এসব মনে হয় না—অভ্যাস হয়ে গেছে।

গতকাল বিকালের দিকে দুখানা বই নিয়ে সে বেরিয়েছিল। দু'নম্বর বাসে চেপে কলেজ স্ট্রিট্ যাওয়ার সময় সে বৌবাজারের মোড়ে নেমে পড়ল। কারণ তার মনে হ'লো কণ্ডাকটর সন্দেহ করছে সে টিকিট কাটেনি সুতরাং—। বাস থেকে নেমে ফুটপাথে উঠেই ভিক্ষুক। আঃ! কি শীর্ণ লোকটার চেহারা! একটা ঝলঝলে ছেঁড়া শার্ট পরনে, নিম্নাঙ্গে কিছু নেই। লোকটা ফুটপাতের ওপর বসে বসে ঘসে ঘসে এগোচ্ছিল। কি বীভৎস! সহসা লোকটা তার পা আঁকড়ে ধরল। ভীষণ গরম একটা হাতের স্পর্শ পায়ের ওপর। সে প্রায় লাফিয়ে সরে গেল। দ্রুত হাঁটছিল সে। যেন পালাচ্ছিল।

...বয়স আঠাশের কিছু বেশী আমি এক যুবক। আমি দাদার রোজগারে খাই। আর যেহেতু বাজার দোকান ইত্যাদি আমার হাতে তাই কিছু পয়সা টয়সা বাঁচাই। তার চেয়ে অভাবে দুষ্প্রাপ্য বই জলের দামে বিক্রি করি। উঞ্ছবৃত্তি! এরপর? এইভাবে আমি যদি কোনদিন ভিক্ষুক হ'য়ে যাই? এইভাবে ফুটপাতে—ছেঁড়া জামা, নিম্নাঙ্গে কোন বসন নেই...ভাবতে গেলে কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটলো তার...কিসব পাগলের মতো চিন্তা! বিষণ্ণ হাসল সে...সময় আলোকের মুখ চেয়ে আছে...একদিন আলো এসে ধুয়ে দেবে সময়ের মুখ...সেদিন সময় অনিন্দ্যসুন্দর হ'য়ে যাবে...। ফুটপাতে সংখ্যা বাড়াচ্ছে মানুষ। দেখতে দেখতে হাঁটছিল সে—শীর্ণ গ্রাম্য বধূ ছেঁড়া কানি পরা তিনটে ইঁটের উনুনে কি যেন ফোটাচ্ছে ভাঙা মালসায়, চারিদিকে ঘিরে বসে আছে হাড় সার শিশুসব। নোংরা ভাইবিন হাঁটকাচ্ছে একটা কাঁচাপাকা গোঁফদাড়ি আর পিটপিটে চোখ একটা লোক।

বই দুটো বিক্রি করে পনেরোটা টাকা পাওয়া গেল। খুব টানাহেঁচড়া দরাদরি করতে হ'লো। দোকান থেকে বেরিয়ে ফুটপাতে পা দিতেই সামনে

আনন্দ। ঝকঝকে উজ্জ্বল মুখে ভরাট হাসি। তার কাঁধে হাত রেখে বলল, আহ্! কতদিন পর দেখা। কেমন আছিস?

—ভাল।

—কিন্তু তোকে দেখে মনে হচ্ছে না, চেহারা অনেক খারাপ লাগছে।

শুনে বিষণ্ণ হাসল সে। বলল, কোথায় যাচ্ছিস?

—কলেজ রো। অফিস ফেরতা একবার কৃশানু'র অফিস হ'য়ে যাই।

—তোর লিটল্ ম্যাগাজিন এখনও মরেনি?

—খবরদার অলুক্ষণে কথা বলবি না। আনন্দ চোখ পাকাল।

যাক্ তোর একটা কবিতা দিস্। আজকাল তুই আর যোগাযোগ রাখিস না, নাম করছিস বলে নাকিরে?

তর্কাতর্কি ইত্যাদি বা খুব বেশী কথা আজকাল তার আর ভালো লাগেনা, কোন উত্তর করল না, বলল, কফি খাওয়াবি?

কফি হাউসে সবুজ টেবিলে হাত ছড়িয়ে তারা বসেছিল মুখোমুখি। আনন্দর ডায়েরী খাতা সে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়ি করল, কলম চাইল। কলম খুলে সূর্য আঁকল—গোল, চারপাশে রশ্মির দাগ, তারপর লিখল।

একদিন সূর্য এসে ধুয়ে দেবে সময়ের মুখ
সেদিন সময় অনিন্দ্য সুন্দর হ'য়ে যাবে
অসুস্থ গাছেরা সবুজ ওড়না গায়ে দাঁড়াবে সজীব
পাখিদের মুহ্যমান ডানা বেগবতী····

গভীর মনোনিবেশে সে কবিতার মধ্যে চলে গেল। চারপাশে কলরবপরিচিত মানুষজন বাড়ী ঘর ছাড়িয়ে, ফেলে রেখে বিষণ্ণতা নৈরাশ্য শোক, ডায়েরীর পাতা হাতের কলম সব পেরিয়ে সে কবিতার গভীরে চলে গেল। তাকে খুব শীর্ণ লাগছিল। কিন্তু তার মুখমণ্ডল ঘিরে বিরাজ করছিল কোন সজল মেঘের ছায়া। তার চোখে ফুটেছিল কালো মেঘের কিনারায় উদ্ভাসিত সূর্যরশ্মি···

অনেকক্ষণ পর কলম বন্ধ করল সে, হেলান দিয়ে বসল। তাকে এখন খুব শান্ত দেখাচ্ছিল। বেয়ারা কফি দিয়ে গেল, আর পকৌড়া। সে আনন্দর দিকে তাকিয়ে আলতো হাসল। বলল, তোর প্রেমিকার খবর কিরে? চাকরি করছিস এবার বিয়ে করে ফেল্।

লাজুক লাজুক হাসি আনন্দর মুখে, আর সুখের উচ্ছ্বাস—দেখে তার বুকের মধ্যে কোথায় শিরশির করে উঠল ব্যথা···আমাকেযদি কেউ ভালবাসত—ভাবল সে। অন্ততঃ এই নিঃসঙ্গতা একাকীত্ব যেভাবে বুকে চেপে বসে—ঘমে ওঠে কি যেন সব কষ্টের ফসল···। ঘাড়ের পেছনে সেই বেয়াদপ যন্ত্রণাটা দপদপিয়ে উঠল। ঘাড়ের পেছনে হাত দিয়ে মাথা ঝাঁকাল, খসখসে গলায় সে বলল, আনন্দ দশটা টাকা দে। আনন্দ কপাল কোঁচকাল—কেন?

—মদ খাবো।

—যাঃ!

—বলছি দে!

এবম্বিধ জেদাজেদিতে সে ভীষণ অস্থির হ'য়ে উঠছিল। তার কপালের একটা শিরা ফুলে উঠল। তাকে ভয়ঙ্কর লাগছিল। আনন্দ দশটা টাকা বার করে দিলো। টাকাটা হাতে নিয়ে সে দ্রুতপদক্ষেপে হলঘর অতিক্রম করল—সিঁড়ি—ফুটপাতে পা দিয়ে তবে যেন নিঃশ্বাস ফেলল। গভীর অবসাদ তাকে ঘিরে ধরছিল, মাথাটা বুকের কাছে ঝুঁকিয়ে সে হাঁটতে লাগল। তার মনে হচ্ছিল কারো ভালবাসা পাওয়া তার ভীষণ দরকার—কাউকে ভালবাসা তার ভীষণ দরকার।

শরীরটা তার মজবুত নয়, সে জানে। দু-চুমুকেই মাথাটা ঝনাৎ করে উঠেছিল। গ্লাস শেষ করে যখন বাইরে এলো তখন তার মাথার মধ্যে খনি-শ্রমিকেরা গাঁইতি চালাচ্ছিল—ঝুর ঝুর করে খসে পড়ছিল কালো চাঁই, কালো স্তূপে সে ক্রমশঃ যেন চাপা পড়ে যাচ্ছিল।

এভাবে ফুটপাতে পা দিয়ে সে দেখল তার সামনে ফুটপাতের প্রান্তে উবু হ'য়ে বসে মেয়েটি হিক্কা তুলছে। তার পাশের টেবিলেই মেয়েটি বসেছিল সঙ্গে দুজন উগ্র আধুনিক যুবক। দুজনেই সমান ঘনিষ্ঠ হচ্ছিল মেয়েটির সাথে এবং মেয়েটিও দুজনকে সমান ভাবে ভাগ করে দিচ্ছিল কটাক্ষ লাস্য এবং কিছু কিছু স্পর্শ—খোলা হলঘরে বসে যতখানি দেওয়া যায়। দু'এক পলক তাকিয়ে দেখেছিল সে—কারণ মেয়েটিকে তার ভীষণ চেনা মনে হচ্ছিল। তারপর ক্রমশঃ যখন মাথা ভারী হ'য়ে উঠছিল আর খনি শ্রমিকেরা তৎপর তখন সে নিজের ভেতর চলে গিয়েছিল।

এখন রাত্রির ছিমছাম পার্কস্ট্রীট দিয়ে চলে যাচ্ছে গাড়ীর স্রোত—ঝকঝকে

হেডলাইট তার চোখে ঝলকে উঠছে সূর্যের মতো। পেছনের লাল আলোগুলি টুপটাপ খসে পড়া ফুল যেন। সে একটু মাথা ঝাঁকাল। মানুষজন কেউ ফিরেও দেখছে না। সে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল। মেয়েটি দু'তিনবার উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করল—পারল না, বসে পড়ল। মেয়েটির সঙ্গীদের সে কোথাও দেখতে পেলনা, বলল, আপনার সঙ্গীরা কোথায়? আপনাকে অসুস্থ লাগছে। মেয়েটি ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল—কটকটে চোখ-বলল, উজবুক। তারপর হাতটা বাড়িয়ে ধরল বলল, ধরুন।

সহসা তার মনে পড়ল সেই ভিক্ষুকটার কথা, হাত বাড়িয়েও সরিয়ে নিতে গেল সে, কিন্তু মেয়েটি তার হাত ধরে ফেলেছিল। অসহ্য গরম হাত, শিউরে উঠল সে—ঠিক সেই ভিক্ষুকের মতো।

মেয়েটি তার গায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াল। সে বুঝতে পারছিল প্রবল জ্বরে তার গা পুড়ে যাচ্ছে।

—উঃ, গায়ে গা লাগিয়ে থাকতে খুব ভাল লাগছে, না।

মেয়েটি গর্জে উঠল যেন,—একটা ট্যাক্সি ডাকুন, ট্যাক্সিতে আপনার গায়ে হেলান দিয়ে বসব।

....মাথার মধ্যে খনি শ্রমিকেরা গাঁইতি চালাচ্ছিল...এইসব অসহ্য অশ্লীল কথা তার মাথা লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারছিল কালো কালো চাঁড়ড়...। অপেক্ষমান একটা ট্যাক্সি হাত তুলে ডাকল সে। মেয়েটিকে ট্যাক্সিতে তুলে দিলে মেয়েটি তার হাত ধরে টেনে নিল ভেতরে, সে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। অথচ সে পালাতে চাইছিল। কিন্তু নিজেকে মনে হচ্ছিল অসুস্থ দুর্বল।

ট্যাক্সি চালক জিজ্ঞাসা করল, কোন দিকে যাবেন।

—কোন দিকে? মেয়েটি তার মুখের কাছে মুখ এনে জিজ্ঞাসা করল, এতো কাছে মুখ যে জ্বরোত্তপ্ত নিঃশ্বাসের স্পর্শ লাগল মুখে।

—আমি কি করে জানবো আপনার বাড়ী কোথায়?—অসহায় গলায় বলল সে।

—বাড়ী কেন? এখনতো যেখানে খুশী আপনি আমাকে নিয়ে যেতে পারেন।—বিড়বিড় করে বলল মেয়েটি,—গঙ্গার ধারে, কিংবা ময়দানে, কী কোন ফ্ল্যাটে—বকতে বকতে সে যেন ঘুমিয়ে পড়ছিল।

সে মেয়েটির কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিলো, চাপা গলায় বলল, কোথায় আপনার বাড়ি বলুন, কোথায়?

—ট্যালিগঞ্জ, সেই ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিও পেরিয়ে···

ড্রাইভার ট্যাক্সি ছুটিয়ে দিলো।

মেয়েটি তার কাঁধে মাথা এলিয়ে দিয়েছে। সে সরে বসতে চাইল। মেয়েটির যেন ঘুম ভাঙল, বিড়বিড় করে বলল, আপনি মাইরি কেমন কাঠ হ'য়ে বসে আছেন। বাজে সময় নষ্ট করছেন কেন? ট্যাক্সি করে যখন বাড়ী পৌঁছে দিচ্ছেন তখন অন্ততঃ একটু আদর টাদর করে নিন্।

—আঃ! ঘৃণায় কাতরে উঠল সে। চুপ একেবারে চুপ, ধমকে উঠল। —আমি আপনাকে ট্যাক্সি করে বাড়ী পৌঁছে দিচ্ছি না, আমার অতো টাকা নেই।

সহসা মেয়েটি কিছুটা সোজা হ'লো—যাঃ! মিস্ ফায়ার! একজন অসহায় মেয়েকে কয়েকটা টাকা খরচ করে বাড়ী পৌঁছে দিতে পারেন না? কি রকম পুরুষ মানুষ?—বলতে বলতে পুনরায় কাঁধে মাথা গুঁজল সে, বিড়বিড় করতে লাগল,—আজকে দিনটাই খারাপ, দুই মক্কেল গালাগালি দিতে দিতে পালাল, আবার এ মক্কেলও ধমকাচ্ছে! তারা কিছুটা দিয়েছিল, বলতে বলতে সে বুকের কাছে জামা মুঠো করে ধরে ঝাঁকুনি দিতে চেষ্টা করল বলল, এ্যাই, এ্যাই, তুমি একেবারে ফোঁপরা। সহসা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল—শুধু শুধু আমার কতগুলো টাকা ট্যাক্সি ভাড়ায় নষ্ট···এইসব কি যেন বলছিল, যদিও মৃদুগলায়, তবু সে তার মুখে হাত চাপা দিয়ে তাকে থামাতে চাইল,—চুপ, চুপ, বলতে বলতে কেমন একটা মায়া তার বুকের মধ্যে উসখুস করে উঠল। মাথার মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণা সত্ত্বেও কেমন এক গভীর মমতা তাকে আচ্ছন্ন করছিল। কাঁধের ওপর এলিয়ে থাকা মাথার রুক্ষ চুলগুলিতে সে হাত রাখল।

হুহু হাওয়া ঝাঁপিয়ে পড়ছে, তার তীব্র গতিবেগ—তার মনে হচ্ছিল পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে সে কোথায় যেন চলে যাচ্ছে। বুকের কাছে আঁকড়ে আছে অসহায় এক মুখ····একান্ত নির্ভরশীল····সময় সূর্যের দিকে তাকিয়ে আছে ভাবল সে···একদিন সূর্য এসে ধুয়ে দেবে সময়ের মুখ··সেদিনের সুসময়ে সব দুঃখ ধুয়ে যাবে তোমার আমার···।

ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিও কোথায় সে জানেনা। কিন্তু ড্রাইভার একসময় গাড়ীর গতি মন্থর করল বলল, এবার কোন দিকে? মেয়েটিকে ঝাঁকুনি দিলে সে, বলল, আমরা এসে গেছি, এবার কোনদিকে? মেয়েটি বোধহয় ঘুমিয়েই

পড়েছিল. অনেক কষ্টে চোখ তুলে তাকাল, হাত তুলে এগিয়ে যেতে বলল, তারপর বাঁদিকে স্বল্প পরিসর একটা রাস্তায় ঢুকে থামার নির্দেশ। ব্যাগ খুলে টাকা দিলো, ড্রাইভার কি ফেরৎ দিলো দেখলোও না, ব্যাগে পুরলো। নামতে গিয়ে টলে পড়ছিল, সে ধরে নামাল। ট্যাক্সি পিছু হ'টে বেরিয়ে গেল।

নির্জন পথ, সামনের এক বন্ধ দরোজার দিকে মেয়েটি হাত বাড়ালে সে তাকে ধরে নিয়ে এগিয়ে গেল, তারপর কড়া নাড়ল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দরোজা খুললেন এক বৃদ্ধা মহিলা থান পরা। তাকে দেখেই অনেকটা ঘোমটা টেনে দিলেন। মেয়েটি কোথা থেকে যেন শক্তি সংগ্রহ করে ছিটকে গেল ভেতরে. দরোজা বন্ধ করে দিলো।

কিছুক্ষণ কেমন একটা ঘোরের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইল সে, তারপর ফিরল। গলিটুকু পেরিয়ে এসে বড় রাস্তা—দেখল ট্যাক্সিটা দাঁড়িয়ে আছে। কোথায় এসেছে ঠিক করতে পারছিলনা, সুতরাং অসহায় ভাবে ট্যাক্সিতেই এসে উঠল সে, বলল ভবানীপুর।

আপন মনে হেসে উঠল সে···মৃত পিতৃদেবের বই বিক্রি করা টাকায় আমি ট্যাক্সি চেপে বাড়ী ফিরছি···বন্ধুর থেকে ভিক্ষে করা টাকায় মদ খেয়ে···এক বেশ্যাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে·· হঠাৎ মাথার মধ্যে কে যেন জোরে গাঁইতি চালাল, 'বেশ্যা' কথাটা খুঁচিয়ে তুলে ফেলতে চাইল যেন। খুব কষ্ট হচ্ছিল তার। মাথা এলিয়ে বসল, অসহায়।

বাড়ীর দরোজায় যখন করাঘাত করল তখন বেশ রাত। মা দরোজা খুললেন এবং সঙ্গে সঙ্গে মৃদু আর্তনাদ—আবার তুই মদ খেয়েছিস?

সারা বাড়ী সুমসাম। সকলে শুয়ে পড়েছে বোঝা যায়। বাইরের ঘরে সে মায়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। চারপাশে ছাদ ছোঁওয়া আলমারিগুলি বইতে ঠাসা এবং তার সামনে দরোজার ওপর বাবার আবক্ষ ছবি—এই ঘরটিতে ঢুকলেই মনে হয় চারিদিক জুড়ে বাবা বসে আছেন। সে অসহায়ের মতো চারিদিকে তাকাল তারপর করুণ আবেদন যেন এই ভাবে—মা কোন কোন গাছ অঙ্কুরেই বিনষ্ট হ'য়ে যায়, কোন কোন গাছ চারাগাছ হ'য়ে মরে, কিন্তু কোন কোন গাছ যৌবনে পৌঁছে, পরিপূর্ণ শাখা প্রশাখায়···মন্ত্রমুগ্ধের মতো সে যেন কথা বলছিল, হাত নেড়ে বোঝাতে চাইছিল—পরিপূর্ণ গাছ যৌবনে মরে যাচ্ছে, কেন না বাতাস বিষাক্ত। জানো মা এক এক সময় নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। আচ্ছা মা তুমি আমাকে আবার গর্ভে ফিরিয়ে নিতে পারো না?—

মায়ের খুব কাছে সরে এলো সে—অন্ততঃ কিছুদিন যদি এই দুঃস্থ আবহাওয়া থেকে সরিয়ে তুমি আমাকে গর্ভের পবিত্র আশ্রয়ে ঘুমোতে দিতে পারতে—

মা পাগলের মতো তার দু'গালে চড় মারছিলেন আর চিৎকার করছিলেন, —আমি কেন মরি না? কেন এখনও মরি না? আমার গর্ভের ছেলে আমার সামনে দাঁড়িয়ে মাতলামি করছে, আমি দেখছি, আঃ ভগবান!

আজ :

মায়ের মৃদু কান্নার শব্দ। একটা ক্ষীণ জলস্রোত যেন গড়িয়ে পড়ছিল পাহাড়ের পাথরে পাথরে। তার বুকের মধ্যে ঝর্ণা। ক্রমশঃ একটা ভালোলাগা তাকে আচ্ছন্ন করছিল।...মা তুমি আমাকে মেরেছো। ...মা তুমি আমাকে ভালবাসো...আমার জন্য তোমার বুকে দুঃখবোধ।

—তুই আমাকে আর কতকাল জ্বালাবি....কবে আমি মরবো—এই সব মা বলছিলেন. এমন সময় বৌদির ডাকাডাকি—মা না খেয়ে রয়েছেন, আমিও খেতে পারছি না, তুমি ওঠো লক্ষ্মীটি—এই সব কথাবার্তা কানে এলো তার, সঙ্কুচিত হ'লো। উঠে নতমুখে বাইরে এলো। তারপর স্নান ঘরে ঠাণ্ডা জল উত্তপ্ত শরীরে....স্নিগ্ধতা...মাঝে মাঝে শরীরকে কষ্ট দিলে অনেক সামান্য কিছু থেকে অনেক ভালোলাগা জন্ম নেয়

ঘাড় নীচু করে খাচ্ছিল সে। মা দরোজার চৌকাঠে হেলান দিয়ে বসে উদাসীন। বৌদি কাছে বসে বকবক করছিলেন—ছেলে একখানা হয়েছে। ইত্যাদি। বললেন, তোমার দাদা কাল অনেক রাত্তির পর্যন্ত অপেক্ষা করেছেন, আজকে সকালেও অনেক হানটান করলেন। গতকাল পিসেমশায়ের সঙ্গে ওর দেখা হয়েছিল তোমার চাকরির জন্য বলেছেন। আগামীকাল তোমাকে নিয়ে যাবেন।...এসব সংবাদে আজকাল তার আর উত্তেজনা জাগে না, স্বাভাবিক খাওয়া সারল চুপচাপ।

খাওয়া সেরে ঘরে এলো। নিজেকে বেশ সুস্থ লাগছিল তার। খোলা জানালা দিয়ে দেখল শরতের উজ্জ্বল রোদ্দুরে ধুয়ে যাচ্ছে পথ। আকাশ গভীর নীল। আজ বোধহয় শনিবার—ওদিকের বাচ্চাদের স্কুলটা ছুটি হয়েছে। কলকলিয়ে শিশুরা যাচ্ছিল। ধীরে রাস্তা মাড়িয়ে চলে গেল একটা নীল রঙের গাড়ী. ড্রাইভার মুখ বাড়িয়ে বাচ্চাদের ফুটপাথে উঠতে বলছিল...ওপারে ফুটপাথে দীর্ঘ দেবদারু গাছটা হাওয়ায় পাতা নাড়াচ্ছে...দেখতে দেখতে একটি

ক্লিষ্ট মুখের ছবি মনে এলো তার—আহা, তাকে যদি আমি দেখতে যাই? রাস্তায় নেমে পড়ল সে।

হয়তো বাড়ীতে তার বিধবা মা। হয়তো ছোট ছোট ভাই-বোন। খুব জীর্ণ মনে হচ্ছিল বাড়ীটা···এক'দন হয়তো স্বচ্ছল ছিল সংসার। মেয়েটি তখন ছোট ছিল বা কৈশোরের ফুটফুটে ফুল। তার বাবা মায়ের মনে হয়তো ছিল অনেক সব নমনীয় মধুর স্বপ্ন। ভাবতে ভাবতে খুটখুট করে তার মনে কে যেন কারুকার্য খোদাই করছিল। সে যেন দেখতে পেল তার সামনে মেয়েটি দাঁড়িয়ে, অপরাধী অপরাধী মুখ, নত চোখ, যেন সে বকেছে। আর ঠিক তখন তার মনে পড়ে গেল—হ্যাঁ সম্ভবতঃ কলেজে যখন পড়ত সে তখন দেখেছে মেয়েটিকে। তাদের সঙ্গেই পড়ত বোধহয়। তার বুকের মধ্যে কোথায় ব্যথা খচ্ করে উঠল।

টালিগঞ্জ গামী একটা বাসে উঠল সে।

একটা দৃশ্য মনে মনে সাজাচ্ছিল:

দরোজায় কড়া নাড়ছি। দরোজা খুললেন থান পরা বৃদ্ধা মহিলা, জীর্ণ শরীর ক্লান্ত বিষণ্ণ চোখ। আমার মুখভাব খুব সৌম্য শান্ত রাখতে হবে এবং চোখে গভীর উদ্বেগ...ওকে একটু দেখতে এলাম, কেমন আছে?···তারপর···সে শুয়ে আছে, পাণ্ডুর মুখ, মাথার কাছে জলের গ্লাস, দাগ দেওয়া ওষুধের শিশি। চোখ খুলে তাকাল, সহসা রাগ বা বিক্ষোভ। আমি শান্ত গলায় খুব আস্তে আস্তে বলব—ওরকম করে না, শান্ত হ'য়ে শুয়ে থাকো, তোমার অসুখ, আমি তোমার সাথে কলেজে পড়তাম—মনে পড়ে? তোমার বন্ধু তোমাকে দেখতে এসেছি—আর কিছু নয়।

ভাবতে ভাবতে শান্ত হাসি ফুটছিল তার মুখে···আমি জানি এই ভাবে আমি তোমাকে গভীর করে ভালবাসব। পৃথিবীতে সকলেই ভালবাসার কাঙাল। কিন্তু কারো কারো ভালবাসার ভীষণ প্রয়োজন। যেমন আমার। এবং তোমার। আমি জানি ভালবাসার ভীষণ প্রয়োজন তোমার। আমি জানি ভালবাসার হাত তোমার রুখু রুখু চুলে আলতো আদর দিলে তোমার সব জ্বালা জুড়িয়ে যাবে।···ক্রমশঃ মমতায় সে ডুবে যাচ্ছিল—সে ভালবাসছিল

টালিগঞ্জ ট্রামডিপোর কাছে কণ্ডাক্টর নামিয়ে দিল, বলল, এখানেই ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিও—কাউকে জিজ্ঞাসা করে নিন্। খুঁজতে খুঁজতে একসময় সেই জীর্ণ

বাড়ী—কিন্তু দরোজা হাট খোলা। খোলা দরোজার সামনে দাঁড়াল সে, আর হৃদপিণ্ড ধক্ করে লাফিয়ে উঠল। ছোট্ট উঠানে বাঁশের খাটে শুয়ে আছে ভালবাসার মেয়ে। সে পরিষ্কার দেখলো পাণ্ডুর মুখ, চোখের কোলে কালো ক্লান্তি নিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে আছে। আহা, মাথার দুপাশে ফুলের সম্ভার। ধূপের সুগন্ধি ধোঁওয়া। উঠোনে ইতস্ততঃ মানুষজন কিছুই তার চোখে পড়ছিল না। সে শুনতে পাচ্ছিল না কান্নার শব্দ। সে শুধু দেখছিল আর দেখছিল ভালবাসার মুখ।

অন্যমনে কখন যেন সে হাঁটতে শুরু করেছিল...একদিন ঈশ্বরের হাত থেকে তুলে নেব শেষ অস্ত্র মৃত্যু—বিড়বিড় করে বলল সে···তুলে নেব নিজ হাতে··· এই ভাবে আমি শান্তির গভীরে চলে যাবো···যেহেতু এখন নিঃশ্বাস নেবার মতো যথেষ্ট বাতাস পৃথিবীতে নেই...যেহেতু সময় বহুদিন ধরে অন্ধকারে....

—কটা বাজে ?

সচকিত তাকাল সে। কি ?

—কটা বাজে ?

সে ঘড়ির দিকে তাকাল কিন্তু কিছুতেই ঠিক করতে পারছিল না কটা বাজে। লোকটা নিজেই উঁকি দিয়ে দেখে নিলো সময়, এগিয়ে গেল।

চারিদিক তাকিয়ে সে দেখল লেকের কাছে এসেছে সে, পায়ে পায়ে চলে এলো জলের কাছাকাছি। চারিদিক নিঝুম। খুব শান্ত হাওয়া। নীল আকাশে সাদা মেঘেরা—অনেকখানি আকাশ একসঙ্গে দেখা যাচ্ছিল। ঘাসের ওপর শুয়ে পড়ল সে। কাছেই একটা কৃষ্ণচূড়া গাছ। উপুড় হ'লো। ঘাসের পাতা দেখল। শীষ। পিঁপড়ে দু' একটা—ব্যস্ত চলাফেরা তাদের। নাম না জানা কীটপতঙ্গ। কোনটা দৃষ্টি দিয়ে অনুসরণ করতে করতে দৃষ্টির বাইরে চলে গেল—কোনটা কাছেই ঘোরা ফেরা করে—ঘাসের শীষ বেয়ে ওঠে নামে···· অনেকক্ষণ এভাবে থাকায় ঘাড় ব্যথা করছিল—চিৎ হয়ে শুলো টানটান। ওপরে ঝিরিঝিরি পাতারা, একটা মাছরাঙা পাখি যেন ধ্যানস্থ বসে আছে ডালে....এই সব ঘাসেরা এই সব গাছপালা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পতঙ্গ পাখি কেমন মিশে আছে প্রকৃতির সাথে। শুধু জীবন ধারণের জন্য যতটুকু প্রয়োজন তার বেশী নেয় না।...আমি বৃক্ষ হ'য়ে জন্ম নিতে চাই কোন এক অরণ্য গভীরে···। সন্ধ্যা হ'লো অন্ধকার নামল সে হেঁটে হেঁটে বাড়ী ফিরল।

দাদার সাথে এক সঙ্গে খেতে বসেছিল। দাদা দু একটা কথা বলছিলেন, পিসেমশায়কে ধরেছি—উনি তো আরও উঁচু পোষ্টে উঠেছেন, আশা করছি চাকরিটা হ'য়ে যাবে তোর। কালকে যদি একটু আধটু ইণ্টারভিউ গোছের নেয়—সকালে উঠে কাগজটা একটু ভাল করে দেখে নিস। শুনছিল সে, কিন্তু কিছুই যেন তার মনে আসছিল না। খাচ্ছিল সে কিন্তু কিছু স্বাদ পাচ্ছিল না। খাওয়া শেষে ঘরে এসে বসলো জানালার ধারের চেয়ারে...বসেই রইলো... বাইরের দিকে চেয়ে রইলো।

ক্রমশঃ রাত্রি গভীর হ'তে গভীরতর। নিস্তব্ধ নিঝুম নির্জন রাতের শহরের দিকে তাকিয়ে সে বসেছিল পাথরের মূর্তি যেন, আর তার মনের মধ্যে ঘোরাঘুরি করছিল কয়েকটি শব্দের শৃঙ্খল—এবার ঈশ্বরের হাত থেকে তুলে নেব শেষ অস্ত্র—মৃত্যু···

স্বল্পালোকে তার চোখ দুটো দেখাচ্ছিল মাংসের দোকানে সাজিয়ে রাখা মাথার চোখের মতো।

সেই নক্ষত্রের কাছে

প্রশান্ত রায়

নির্দিষ্ট জামরুল গাছের নীচে দাঁড়ায় সে। দীঘির পাড়ে। অন্ধকার তেমন গাঢ় নয়। দূরে, আকাশে এক ফালি চাঁদ আর অনেক তারা—দীঘির স্থির জলে প্রতিবিম্বিত। একটু আগে ট্রেনের হুইসিল শোনা গিয়েছিলো। অদূরে ষ্টেশন, তার পেছনে রেলওয়ে কোয়ার্টার্স, তারই পেছনদিকে এই জায়গাটা। বেশ নির্জন। অবশ্যি, এখানে আসার সময় আজও তার চোখে পড়েছে—দুটো গাছের নীচে দু'জোড়া যুবক-যুবতী। চারদিকে ভালো ক'রে দেখলে, আরও পাওয়া যায়। অর্থাৎ প্রেম-নিবেদনের পক্ষে এ-অঞ্চলে এটা একটা 'পীঠস্থান'।

পলার সঙ্গে দেখা করবার জন্য সে এখানে এসেছে এর আগে দু'দিন, আজ নিয়ে হবে তৃতীয় বার। তবে, পলার সঙ্গে এখন যে তার সবে প্রেমে পড়া-পড়ি চলছে তা নয়। এ-ব্যাপারটা তাদের মধ্যে দীর্ঘ তিন বছরের। পলাদের বাড়িতে ছিলো তার অবাধ যাতায়াত। অথচ পলার সঙ্গে দেখা করবার জন্যই তাকে এভাবে এখানে আজ আসতে হয়েছে।

বাঁ হাতের কব্জি এবং ঘাড় পরস্পরকে খুব কাছাকাছি এনে সে দেখলো—সাতটা বেজে পাঁচ। সাড়ে সাতটার মধ্যে পলা আসবে বলেছে। এখানে, এ-রকম নিরালায়, জলের ধারে, সন্ধ্যার অন্ধকারে, তার সঙ্গে পলা দেখা করতে চেয়েছিলো গত শনিবার। সেটা এই 'সিজনের' প্রথম দিন। ব্যাপারটা সেদিন দুপুরেও সে জানতো না। অফিস থেকে ফেরার পর তার ছোটোবোন বলেছিলো, দাদা, অমিয় জ্যেঠুর মেয়ে—পলাদি এসেছিলো। এই খামটা তোমাকে দিতে ব'লে গেছে। জ্যেঠুর কি দরকারী কাগজ আছে, তোমায় দেখতে বলেছে।

—আর কিছু বললো? সে জিজ্ঞেস করেছিলো।

—না—আমাকে বললো, এটা দাদাকে দিয়ে দিও, খুব জরুরী—।

তার আর পলার ভেতরকার গভীর সম্পর্কের কথা বাড়িতে এখনো কেউ জানে না। সে নিজের ঘরে গিয়ে খাম ছিঁড়ে কাগজটা পড়লো। সংক্ষিপ্ত

চিঠিতে পলা জানিয়েছে : সন্ধো সাতটায় রেলওয়ে কোয়ার্টার্সের সেকেণ্ড গেটে থাকতে হবে। জরুরী কথা আছে। কী এমন জরুরী কথা? বাড়িতে বলা যায় না? সে আর পলা তো কতোদিন পলাদের ছাদে ঘুরে বেড়িয়েছে, বসেছে, কথা বলেছে, কেউ কিছু বলেনি অথবা মুখের ভাবে বিরক্তি প্রকাশ করেনি। তবে? সে মনে মনে অবাক হয়েছিলো।

সেদিন সন্ধ্যে সাতটার কিছু আগেই নির্দিষ্ট স্থানে গিয়েছিলো সে। সময়মত এসেছিলো পলা। সঙ্গে ছিলো পলার বান্ধবী। সুতপা। সামনা-সামনি আসতে, সে দেখেছিলো—সামান্য হাঁপাচ্ছে পলা। তারপর পাশাপাশি তারা হাঁটছিলো। সে চুপচাপ পলার কথা শোনার জন্য অপেক্ষা করছিলো। এই জামরুল গাছটার কাছে এসে পলা বলেছিলো, এই জায়গাটায় ঘাস আছে বেশ—বোসো। রুমাল পেতে ব'সেই সে উদগ্রীব প্রশ্ন করে, জরুরী কথাটা কী? যে জন্য এখানে আসতে হলো? সুতপা মেয়েটি কোনো ইতস্ততঃ করেনি। অনায়াস ভঙ্গীতে একটু দূরে, একা, জলের ধারে গিয়ে বসে। এ-রকম ভাবে বহুদিন সুতপা ওদের কথা বলার সুযোগ দিয়েছে।

দু'টো হাত হাঁটুর ওপর জড়ো ক'রে পলা বলেছিলো, কাল রাত্তিরে বাড়িতে খুব অশান্তি হয়েছে—

—কী নিয়ে?

—বলছি। এ-ই সুতপা, এখানে আয় না। সুতপাকে কাছে আসতে বলে পলা। কিছু না-বললে নয়, এ-রকম ভাবে লোকে যেমন 'হুঁ' বলে, ঠিক সে ভাবেই সুতপা আবছা গলায় বলে,—যা-ই।

পলা বলতে শুরু করেছিলো : পরশু—পরশু না, তার আগের দিন সকালে, বাবা আমার কাছে একটা ফটো চেয়েছিলো—আমার সেই সিঙ্গল ফটোটা—নেজন যেটা তুলেছিলো জন্মদিনে—। আমি জিজ্ঞেস করলাম—কেন? বাবা বললো, তোর একটা ভালো সম্বন্ধ পাওয়া গেছে, ছেলেটি হাইলী কোয়ালিফায়েড, ডাক্তার। ওর মা বাবা তোর ফটো দেখতে চেয়েছেন।...শুনে প্রথমে আমি আমার পার্ট টু পরীক্ষার অজুহাত দেখলাম। বাবা বললো,—আহা, তুই পরীক্ষার জন্য তৈরী হ' না, এখন থেকে আমি আস্ট দেখাশোনাটা সেরে রাখতে চাই। তখনি আমি বুঝলাম—বাবা 'দেখাশোনা' সেরে রাখতে চায়—তার মানে এই ডাক্তার ছেলেটিকে বাবার দারুণ পছন্দ। এরই সঙ্গে আমার বিয়ের কথা পাকাপাকি করে ফেলবে। আমার হঠাৎ কী হলো, দুম ক'রে

বলে বললাম—না, এখন আমি বিয়ে করবো না, তাছাড়া আমার বিয়ের জন্য কাউকে দেখা-শোনা করতে হবে না। সে লক্ষ্য করেছিলো: পলার গলার স্বরে বেশ উত্তেজনা। আকাশের দিকে একটুক্ষণ চোখ রেখে সে বলেছিলো, তারপর?

—বাবা তখন আর কিছু বললো না—। পরশু, বাবা অফিসে বেরোবার পর মা আমাকে চুপিচুপি সব জিগ্যেস করলো। আমি দেখলাম—মার কাছে ব্যাপারটা চেপে যাবার কোনো মানে হয় না। তাছাড়া, জানাতে যখন হবেই।....আমি সবই বললাম। আর এ-কথাও বললাম যে, সোমককে ছাড়া আমি আর কাউকে বিয়ে করতে পারবো না।

—হুঁ। 'হুঁ' শব্দটা তার নিজের অজান্তে, যেন গলা-ফস্‌কে বেরিয়ে আসে। যে-কারণে একটু ঘড়ঘড়ে শোনায়। নিজের নাম-জড়িত এ-রকম প্রসঙ্গে হঠাৎ সাড়া দিয়ে ফেলে সে ভীষণ লজ্জায় পড়ে যায়। মনে মনে এবার শিরদাঁড়া সোজা ক'রে বসে সে। পলার মুখের দিকে সজাগ চোখ রাখে। প্রশ্ন করে, আমার কথা শুনে তোমার মা কী বললেন? মানে, আমার সম্বন্ধে তাঁর ধারণাটা পাল্‌টে গিয়ে আপাততঃ কোথায় দাঁড়ালো—

—সব শুনে, মার মুখটা কিছুক্ষণের মতো 'ফ্রিজ' হয়ে গিয়েছিলো। তারপর বললো, সোমকের সঙ্গে তোর বিয়ে হ'তে পারে না।

—কেন? খুব চাপা শক্ত গলায় নিজের অজ্ঞাতসারে সে জিজ্ঞেস করেছিলো। পলা আম্‌তা আম্‌তা করে প্রথমে। তারপর বলে, মা বলছিলো যে, সে ডাক্তার, প্রচুর ইনকাম করে, আর তোমার তো—

—হুঁ। তার গলা ভারী। পলাও চুপ হয়ে যায়। সে বলে, এ-ছাড়া কাস্টের ব্যাপারে কিছু বললেন? পলা, তুমি তো আমাকে জানো—ফ্র্যাঙ্কলী বলো—আমি কিছু মনে করবো না।

—হ্যাঁ, সে কথাও বলেছে। অন্ধকারে দু' হাঁটুর মধ্যে একটুক্ষণ মুখ ডোবায় পলা। মুখ তোলে। বলে, প্রথমেই এ-কথাটা উঠেছিলো। মা আমাকে বললো, তুমি ব্রাহ্মণ, আর সোমক হচ্ছে মণ্ডল—এতোটা বে-জাতে তোমার বাবা কিছুতেই বিয়ে হতে দেবে না, তাছাড়া আমিও দিতে পারি না···

সে ঈষৎ ঘাড় ঘুরিয়ে অন্ধকার দীঘির দিকে চোখ রেখেছিলো। পলা আরও কি কি যেন বলছিলো। সে শুনতে পাচ্ছিলো না। তখন সে মনে মনে বলছিলো: পলাকে তার মতো ভালোবাসতে পারবে ডাক্তার? পারবে?

তার ধারণা—কেউ পারবে না। তাদের দু'জনের ভালোবাসা কি দু'দিনের? না দু'কথার? পরস্পরের কাছে পরস্পর ঘনিষ্ঠ হয়েছে আস্তে আস্তে···

তার মনে পড়ছিলো—প্রবালের মুখটা। প্রবাল তার প্রিয় বন্ধু। পলার বড়ো জ্যাঠার ছেলে। বি, এস. সি পাশ ক'রে, তারা দুজন ভর্তি হতে গিয়েছিলো মিলিটারীতে, ট্রেনিং কোর্স-এ। কিন্তু দু বছর পর ক'লকাতায় চাকরীর ব্যবস্থা ক'রে প্রবালের বাবা জানিয়েছিলেন প্রবালকে। প্রবালের সঙ্গে সে ও ফিরে এসেছিলো। পলাকে সেই ছেলেবেলা থেকেই ভালো লাগতো তার। দু'বছরের ব্যবধানে অনেক পরিবর্তন দেখেছিলো সে পলার মধ্যে। তখন পলার বয়স 'সুইট সিক্সটিন'। সে জানতো—প্রবালকে ছাড়া ট্রেনিং কোর্স-এ থাকা তার পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার। ঠিক সে সময়েই সে পেয়েছিলো অনাবিল অনুরাগ, পলার কাছ থেকে। সুতরাং সে-ও প্রবালের অনুসরণে, ট্রেনিং-কোর্স-এ ইস্তফা দিয়েছিলো। কিছুকাল বেকার অবস্থায় কাটাবার পর তার একটা চাকরী জুটেছে। পারিশ্রমিক মন্দ না।

ইদানীং পলাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখে সে। একটা ঘরে শুধু সে আর পলা। সে খাটে বসে আছে। বাগানের দিকের জানলার কাছে দাঁড়িয়ে পলা। তার দিকে ফেরানো মুখ। পলার কাঁচা-মুখে, খোলা চুলে অবিরল জ্যোৎস্না—জ্যোৎস্নার গন্ধ···ভাবতে ভাবতে সে নিঝুম হয়ে যায়। অফিস থেকে ফেরার সময়, প্রচণ্ড ভিড় বাসে, যখন তার বুকে-পিঠে ঘামে লেপ্‌টে থাকে গেঞ্জি, মুখ তেতো—হঠাৎ যেই তার মনে হয়: কিছুক্ষণ বাদেই পলার সঙ্গে আমার দেখা হবে তখন এই সব অস্বস্তি বড্ড লঘু ব'লে মনে হয় তার।

সেদিন তারপর তারা উঠে দাঁড়িয়েছিলো। সুতপা উঠে এসেছিলো জলের ধার থেকে। তারা তিনজন রেলওয়ে কোয়ার্টার্সের এলাকা পেরিয়ে এসেছিলো। 'পরশু সাড়ে সাতটায় এখানে এসো, কেমন?' ব'লে সুতপাকে নিয়ে এগিয়েছিলো পলা। সে তার ক্লাবের পথ ধরেছিলো।

তার মনে হচ্ছিলো—প্রত্যেকটা মানুষই এক-একটা ভণ্ড। যে যেই প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে, তাকে কেউ সেই-অনুযায়ী বিচার করে না। বিচার করতে গিয়ে তাকায় অন্যদিকে। এ-রকম একটা ঘটনা কিছুদিন আগে পলাকে বলেছে সে।

—তুমি উজ্জ্বলকে চেনো তো?—আমার দু'মাস বাদে অফিসে জয়েন করেছিলো,—ওকে নিয়ে আজ অফিসে একটা ঝঞ্ঝাট বেঁধে গেছলো।

—কী হয়েছিলো ? জিজ্ঞেস করেছিলো পলা।

—এ-মাসে একদিন উজ্জ্বল অফিসে এসেছে সবে, এমন সময়, আমাদের আর একজন কলিগ্, উজ্জ্বলের খুব বন্ধু সে—সান্তাল—ওর বাড়ি থেকে ফোন এলো যে ওর বাবার হঠাৎ করোনারির স্ট্রোক হয়েছে। তক্ষুণি সান্তালের সঙ্গে চ'লো গেলো উজ্জ্বল—ও তখনো অ্যাটেন্ডেনস্ খাতায় সইও করেনি। কে একজন মারা যাওয়ায় সেদিন আমাদের অফিস হাফ-হলিডে হয়ে গেলো। উজ্জ্বল আড়াইটে নাগাদ ফিরেছিলো, ফিরে আর কাউকে পায়নি। যাইহোক, আজ পেমেন্টের সময় ক্যাশিয়ার উজ্জ্বলকে ওই দিনের টাকা বাদ দিয়ে স্যালারী দিয়ে ছিলেন। উজ্জ্বল ওনাকে ব্যাপারটা খুলে জানালো। বললো, আপনি আমার কলিগ্দের এখনি আলাদা জিজ্ঞেস ক'রে খোঁজ নিতে পারেন—আমি সেদিন···। তো ক্যাশিয়ার কিছুতেই উজ্জ্বলের কথাটাকে ইম্পর্টেন্স দিচ্ছিলেন না। অথচ এ-রকম কেস্-এ এন্কোয়ারী-টেন্কোয়ারী করে পেমেন্ট করারও ব্যবস্থা আছে। আসলে, উজ্জ্বলের কেস-এ ক্যাশিয়ার এ-সব নিয়ে মাথা ঘামাতে চাইছিলেন না, যেহেতু ওদের মধ্যে কি এক পারসোনাল খটাখটি আছে। উজ্জ্বল স্যালারী রিলিভ্ না ক'রে, সোজা আমাকে এসে জানালো, এই এই হয়েছে।···তার মনে আছে। সেদিন এই পর্যন্ত শোনার পর তার দিকে অপেক্ষাকৃত একাগ্র চোখ মেলেছিলো পলা। যে চাহনীর অর্থ—তারপর ?

—মোটামুটি পেমেন্টের কাজ শেষ হয়ে আসার পর আমি ক্যাশিয়ার বাবুর কাছে গিয়ে স্ট্রেট বললাম, উজ্জ্বলের ও'দিনের টাকাটার ব্যবস্থা আপনাকে ক'রে দিতে হবে। আমি ওকে দেখেছি...। তাছাড়া আপনি তো শুনেছেনই ও কোথায় গিয়েছিলো—। এরপর ক্যাশিয়ার আর কথা বাড়ালেন না। ওঁর চোখ দেখে বুঝলাম—ভদ্রলোক মনে মনে বেজায় খাপ্পা হয়ে উঠেছেন। সামান্য হ'লেও জব্দ করার একটা 'সুবর্ণ সুযোগ' এভাবে হাত-ছাড়া হয়ে গেলে, কে-না রেগে যায় বলো। মৃদু হেসে সে পলাকে বলেছিলো, শেষে ক্যাশিয়ার নিজেই ব্যাপারটা টেক্-অ্যাপ্ করলেন। আসলে, উনি জানেন, ওঁদের পাড়ারই··· ব্যায়াম সমিতি'তে আমার রেগুলার যাতায়াত—

—তুমি হীরো বনে গেলে অফিসে—বলতে বলতে হাসছিলো পলা। সেদিন রাত্রে, শুয়ে-শুয়ে সে ভেবে দেখেছিলো যে, উজ্জ্বল এবং সে অফিসে একই পোষ্ট-এ—অর্থাৎ লমপ্র্যাটফর্মে কাজ করে ; অথচ ক্যাশিয়ার যে-কারণে তাকে

পাত্তা দিয়েছে, তার সঙ্গে অফিসের কোনোই সম্পর্ক নেই, তবু··· । এভাবেই ক্যাশিয়ার বাবুর মতন প্রায় সব মানুষই ভণ্ডামী করে, করতে করতে বেঁচে থাকে··· কিন্তু—

এখন, কাপড়া খস্ খস্ শব্দে বাঁ-দিকে ঘাড় ফেরালো সে। অনেকটা দূরে, কোয়ার্টার্সের ফার্স্ট গেটের কাছে—অস্পষ্টভাবে সে দেখতে পেলো—একটি মেয়ে, সম্ভবতঃ যুবতী, আস্তে আস্তে হেঁটে আসছে। এ-সময়ে একলা একটি মেয়ে—সঙ্গী কোথায়? সে ভাবে, আবার সে মনে মনে বলে, যাক্‌গে। দীঘির দিকে ফিরে তাকায় সে। সিগারেট ধরায়। ধোঁয়া ছাড়ে। তারপর আকাশের দিকে চোখ তোলে। অনেক তারা আকাশে।

একটা নক্ষত্রের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে, একটু সময়ের মধ্যেই কেমন যেন হয়ে যায় সে—একাগ্র—এ-মুহূর্তে বিরাট ছাই-গাদায় এক টুকরো জলন্ত আগুন যেন ওই নক্ষত্রটা তার দৃষ্টির গভীরে ··। হঠাৎ তার খেয়াল হয়: ঘন ঘন দু'বার সিগারেটে টান মারে। কী জানি কেন, তার মনে হয়: এমনি ভাবেই সে পলাকে ভালোবাসবে। যেমন ভাবে, একটু আগে তার ভেতরকার মানুষটা ভালোবাসছিলো ওই নক্ষত্রকে। সে জানে, 'ভণ্ডামী' ছাড়া এ যুগে বাঁচা দায়। তবু সে শুধুমাত্র পলাকে, খাঁটি একজন মানুষের মতো, ভালোবাসবে, ভালোবাসা প্রার্থনা করবে। পলা····।

—কখন এসেছো তুমি? চমকে পেছন ফিরে সে দেখলো—পলা।

—তুমি একলা এলে! সুতপাকে নিয়ে এলে না কেন? সে জিজ্ঞেস করলো। একটু আগে, দূরে তবে কি সে পলাকেই দেখেছিলো!

—বসা যাক। বলে সে ঘাসের ওপর বসে পড়ে। পলা দাঁড়িয়ে থাকলো। ক্ষীণ চাঁদের আলোয় সে দেখতে পায়: পলার দু'চোখ অন্যমনস্ক।

—কী হ'লো, ব'সো।

—হুঁ, বসছি। এবার আস্তে আস্তে ব'সে পড়ে পলা। তার মুখোমুখি। চুপচাপ। সেও কিছু বলে না, অপেক্ষা করে। মিনিট চারেক কেটে গেলো। হঠাৎ পলা ব'লে ওঠে: আমাকে তুমি ক্ষমা করতে পারবে? মুহূর্তের মধ্যে সে অনুভব করে: কথাটা বেশ ঠাণ্ডা এবং বাঁধুনীতে আঁটসাট। কথাটা ব'লে নিশ্চুপ হ'য়ে যায় পলা।

—কেন, কী হয়েছে? তুমি কী বলতে চাও—মানে তুমি কী বলবে, সেটা

আমার ক্রীয়ায় করে বলো। তার গলার স্বরে ফুটে বেরোয় ক্ষুব্ধতা। পলার দীর্ঘশ্বাসের আওয়াজ শোনা যায়। এখন ওর বুক সামান্য ওঠানামা করছে। পলা বললো, আমাকে ক্ষমা করতেই হবে তোমায়, সোমক। না বোঝা গলায় সে বলে, কী হয়েছে, সেটা বলো না।

—তুমি আমাকে ভুলে যাও, তুমি আমার সঙ্গে আর সম্পর্ক রেখো না সোমক। সে বুঝতে পারে: পলার শেষের কথাগুলো কেমন ধরা ধরা। তার দু'চোখে অপেক্ষা, পরবর্তী কথা শোনার জন্য। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হ'য়ে থাকে পলা, তারপর বলে, মা'র কাছ থেকে সব শুনে বাবা খুব রেগে গিয়েছিলো প্রথমে। তারপর আমি জেদ ধ'রে বললাম যে, এখন আর আমার জন্য কোনো সম্বন্ধ দেখতে হবে না। একটু থেমে, পলা বলে,—কাল বাবা আমাকে বললো, তুই আমার একমাত্র মেয়ে পলা; তোর জন্যে কি আমার কোনো সাধ-আহ্লাদ থাকতে পারে না····। বাবার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছিলো। বলতে বলতে, পলার গলার স্বর ডুবে যায় এবং সে অনুভব করে: যেন কিছু একটা গলা থেকে ঠেলে বুকের ভেতর তলিয়ে যেয় পলা।

—তা' হ'লে তুমি কী ঠিক করলে? কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থেকে এবার সে জিগ্যেস করে। ক্ষীণ চাঁদের আলোয় পলার মুখের দিকে চেয়ে, সে টের পায়: ওর বুকে, চোখের আনাচে কানাচে, এখন যেন এক ভয়ন্ত মৌচাক; একটু খোঁচা লাগলেই, ঝর্‌ঝর্ ঝর্‌ঝর্ ক'রে চোখ ফাটিয়ে ঝ'রে পড়বে জল····। এবং যে কারণে পলা কথা বলছে বেশ থেমে থেমে। তার মনে হয়: পলার মা-বাবা তো তাকে বহুদিন যাবৎ দেখেছেন। অথচ, ওঁরা পর্যন্ত তার যোগ্যতা অনুযায়ী তাকে বিচার করলেন না···। তার সিগারেট ধরা আঙুল ঈষৎ কাঁপে। শেষ টান দিয়ে ওটাকে দূরে ছুঁড়ে দেয়।

—আমি ভেবেছি—ধরা গলায় পলা বলে,—আমি কারুর মনেই কষ্ট দেবো না, সারা জীবন আনম্যারেড্ থাকবো। তুমি চেষ্টা ক'রো আমাকে আস্তে আস্তে ভুলে যেতে···

তার বুকের গভীর থেকে বেরিয়ে আসে দীর্ঘশ্বাস। সে স্পষ্ট দেখতে পায়: পলার নাকের পাটা আর ঠোঁট ঈষৎ কাঁপে। হাত বাড়িয়ে পলার হাত ছোঁয় সে। ধরে। ঠাণ্ডা হাত। তারপর সেই হাত তুলে নিয়ে ধীরে ধীরে নিজের ঠোঁটে ছোঁওয়ায়।—তার ঠোঁট দু'টোও বড়ো ঠাণ্ডা। হাতটা যথাস্থানে রেখে আঙুল দিয়ে পলার চিবুক স্পর্শ করলো সে।

—পলা, লক্ষ্মীটি, এ রকম কথা ব'লো না। তুমি বিয়ে করবে না কেন? আরও সময় নিয়ে ভাবো, ভেবে দেখো। এই কথাগুলো সে বিজ্ঞের মতনই বলে ফেলে। অথচ আদর করে, পলার অলক্ষ্যে সে বারবার চোখ দিয়ে আদর করে পলাকে। কাঙালের মতো।

তারপর সে আকাশের দিকে চোখ তোলে। তার আঙুল আর পলার উরু ছোঁয়াছুয়ি হ'য়ে আছে। আকাশের তারার ভিড়ের ভেতর থেকে খুব সন্তর্পণে সে সেই গভীর নক্ষত্রটিকে খোঁজে। খুঁজতে থাকে····।

মলিনা মলিন নয়

কিরণ চন্দ্র মৈত্র

প্রেমের সন্ধান করছি ঠিকই, তবে সেটা নিজের জন্যে নয়। জীবনের পঞ্চম মার্গের সামান্য নীচে অবস্থান করছি ; প্রেমের জন্যে আমি মোটেই চঞ্চল নই। আমার প্রেম দ্রবীভূত-ঘনীভূত-মন্ত্রীভূত-কেন্দ্রীভূত হয়েছে ওই এক জায়গায়—বিউচুয়্যাল পাকাচুল তোলায় যার একমাত্র বহিঃপ্রকাশ। সমস্যাটা একটু খুলেই বলি।

সম্পাদকের চিঠি পড়েত মাথায় বজ্রাঘাত। নিজেকে উনার ভাই সম্বোধন করে—কেন যে ছাই লেখকের পাতায় নাম লিখিয়েছিলাম। সম্পাদকের আব্দার—গল্প চাই—টকটকে তাজা প্রেমের গল্প। পত্রিকার আগামী সংখ্যা 'প্রেমের গল্প সংকলন' হিসাবে আত্মপ্রকাশ করছে। দশদিনের মধ্যে আমাকে একটা গল্প দিতেই হবে। এখন দিতে হবে বলেই'ত আর দেওয়া যায় না ; না সব উজাড় করে দিয়েও কূল পাওয়া যায়। যুগটাই যে দিতে হবে দিতে হবের যুগ। কিন্তু তাঁর সামান্য দাবি আমার কাছে যে কী মারাত্মক ব্যাপার! সেই যে দুষ্টু ছেলেদের উদ্দেশ্যে ব্যাং বলেছিল—বাছারা, তোমাদের কাছে যেটা খেলা আমাদের কাছে সেটা মৃত্যু। আমি এক অকাল-অপক্ক ফোর্থগ্রেড লেখক। সামান্য যা কিছু লিখি সবই প্রায় জীবনের অভিজ্ঞতাজাত। একেবারে সদ্য-কাটা পাঁঠার রক্তের মত তাজা অভিজ্ঞতা। এই হাতে প্রেমের গল্প লেখাকি চারটিখানি কথা। তাও আবার নবীন বা একেবারে ভোরের টাটকা ফুলের মত।

উঠতি বয়সে বার কয়েক প্রেমের চেষ্টা করিনি তা নয়। টোপ ফেলেছিলাম ; কিন্তু টোপ গেলাত দূরের কথা কেউ স্পর্শই করল না। যা চেহারা। যিনি বর্তমানে আমার 'বেটার হাফ' তার শুভ দৃষ্টি খুব শুভ হয়েছিল বলে মনে হয় না। শুভ দৃষ্টির পর আর একবার দৃষ্টি বিনিময় হলে দেখা যেত তার চোখের জলে বান ডেকেছে।

নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে গল্প ফাঁদলে এ যুগের অনেক রোমিও হয়ত ভয় ও বিরক্তিতে ও লাইনই ছেড়ে ছুড়ে দেবে। প্রেমের খেলা বলতে

যা ওই বিতুর মায়ের সঙ্গে ; তাও বিয়ের পর। বিয়ের পর একদিন আচমকা ধরে চুমো খেতে গিয়ে কি বিপদ—এইসা চিৎকার দিল—ভাগ্যিস ধারে কাছে কেউ ছিল না। একদিন অফিস কামাই করলাম, কিন্তু লজ্জায় সারাটা দিন একবারও কাছেই এল না। সুযোগ মত একবার হাত চেপে ধরলাম—ছি ছি করে উঠল—পুজোর কাপড় ছুঁয়ে দিলে, আবার চান করতে হবে। একবার ঠিক করলাম ওকে নিয়ে গঙ্গার ধারে বেড়িয়ে পার্কস্ট্রীটের চীনা রেস্তোরাঁয় খেয়ে বাড়ি ফিরব—শেষ পর্যন্ত যেতে হ'ল কালীঘাটে। সে সব অভিজ্ঞতা বড়ই বেদনাদায়ক। বনগোলাপের মত, গাছের ডগায় একটা ফুল থাকল কি থাকল না, সারা দেহটা কাঁটায় কাঁটায় জর্জরিত।

হাতের কাছে তারকের কেসটা রেডি ছিল—একেবারে তাজা-নবীন গরম রোম্যান্টিক প্রেমের গল্প। কিন্তু ওর কেসটা যতদূর শুনেছি সম্প্রতি কেঁচে গেছে—মিলন না হতেই বিয়োগান্ত পরিণতি! তারক আমাদের বাড়ির চাকর। বছর বাইশ বয়েস। চালু ও চটপটে। লিখতে পড়তে জানে, অর্থাৎ শিক্ষিত। অনেক গুণ আছে ছেলেটার। ও আছে বলে আমরা কোনদিন পাঁউরুটি বা কেরোসিনের অভাব বুঝিনি। বাঁশী বাজাতে পারে, ভলি, ফুটবলও খেলতে পারে নাকি। ছুতোর মিস্ত্রির সব কাজ জানে। কিন্তু বাড়ির চাকর, কাজেই আত্মপ্রকাশের কোন সুযোগ নেই। আমার সাথে ওর খাতিরটা একটু বেশী। আমি ওকে মানুষের মর্যাদা দিয়ে থাকি ; পুরণো জামা-প্যান্ট দিয়ে ওকে সামান্য কেতাদুরস্ত হবার সুযোগ করে দিয়েছি। তাছাড়া ওর বদ্ধমূল ধারণা, টাকা জমিয়ে ও যখন ছুতোর মিস্ত্রির ব্যবসা করবে আমি ওকে অনেক কাজ জুটিয়ে দেব। সে যাই হোক পাশের বাড়ির ঝি, বিন্দের মা, ভাগ্য মিডিয়া আমার স্ত্রীর কাছ থেকে তারক সম্পর্কে কিছু মুখরোচক গোপন তথ্য পাওয়া গিয়েছিল। তারক প্রেমে পড়েছে ও চুটিয়ে প্রেম করছে। নায়িকা, মিত্তিরদের বাড়ির ঝি মলিনা। শক্ত-সোমত্ত মেয়ে; বেশ ডব্‌কা চেহারা।

মিত্তির গিন্নীর সিনেমার বই পাল্টাতে মলিনা প্রায়ই আমাদের বাড়ি আসে। দু একবার টেরিয়ে দেখিনি বল্লে মিথ্যে বলা হবে। তারক বেটার 'চয়েস' আছে। তারক মলিনাকে জল পাম্প করে দিচ্ছে ফুটপাতে এ দৃশ্য দু' একবার আমার চোখেও পড়েছে। ওরা নাকি জোট করে একসাথে রেশন তোলে ;

লাইনে দাঁড়ায়; দুপুরে পাড়ার পার্কে ফষ্টিনষ্টি করে। সম্প্রতি নাকি ওরা দুজনে 'ববি' দেখেছে। এমন চমৎকার প্লট। কিন্তু গত রাত্রে পরিবারের মুখে শুনলাম সব আপসেট হয়ে গেছে। আমাদের তারকচাঁদ কাজ কাম ছেড়ে সাট্টা খেলা ধরেছে—সে নাকি আওয়ারা হয়ে যাবে। ঘটনার বিবরণ অত্যন্ত করুণ। মিত্তিরের হারামজাদা মার্কা সেজ ছেলেটি, মলিনার পেছনে লেগেছিল। অনেক চেষ্টা করেও মলিনা আত্মরক্ষা করতে পারেনি। ছোরা দেখিয়ে নাকি কাজ হাসিল করেছে। মলিনা অন্তঃস্বত্বা। তারক ঝগড়াঝাটি করে মলিনার সাথে সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়েছে। তারক নাকি শাসিয়েছে মলিনা আর ওই শয়তানকে খুন করে জেলে যাবে। সুন্দর একটা প্লটের দফা-রফা!

কলকাতার আকাশে-বাতাসে হাটে-ঘাটে নাকি প্রেম ছড়িয়ে আছে। আমাকে একটা প্লট ধরতেই হবে। অগত্যা অফিসের পর নিয়ম করে আমি ঘুরি ফিরি কলকাতার ঘাটে ঘাটে প্রেমের সন্ধানে। যদি একটা স্ন্যাপ-শট্ পাওয়া যায়, প্রিন্ট-এনলার্জ করে চালিয়ে দেওয়া যাবে। পাড়ার 'টিনএজারর্স'রা চুটিয়ে প্রেম করে জেনেও ওদের ধারে কাছে ঘেষলাম না। প্রথমত, চুল সাজ-গোজের যা বহর তাতে বিপদ-সীমা পেরিয়ে খুব কাছে না গেলে বোঝাই দায় কোনটি রোমিও আর কোনটি জুলিয়েট! দ্বিতীয়ত, ওরা আজকাল 'তুই' সম্বোধন করে। কাজেই বোঝা দায়—ভাই-বোন না নায়ক-নায়িকা।

শূন্য মনে বেরিয়ে পড়লাম পাড়ার বাইরে। যেমন প্রতিদিন শূন্য থলে নিয়ে বাজার করতে যাই। প্রায়-দিনের মাছের শূন্য থলের মত শূন্য মনেই ফিরে আসতে হয়।

ডালহৌসির প্রেম আমার মোটেই পছন্দ নয়। এখানে ঘামের কাছে সেন্ট পরাজিত। দু'জন পাশাপাশি চলছেন—হাঁটছেন যেন লেফট-রাইট—একটি বারও ছন্দপতন নেই। কথা হচ্ছে স্বাভাবিক গলায়—অফিস, ইউনিয়ন, অর্ডিন্যান্স, বাজারদর, কিছুতেই চালাতে পারছিনা ইত্যাদি। আর চলতেও যেন পারছেন না—একখানা খালি ট্রাম-বাস চোখে পড়ামাত্র—"ওই আমার গাড়ি এসে গেছে—চলি।" চোখে-মুখে এতটুকু ভাবান্তর নেই। পে.-দৌড়; তারপর একলাফ ও একটি সিট্ দখল—প্রেমের জয় থেকে বাসে সিট জয় অনেক বড়।

আমি শ্যামবাজারের 'শশীবাবু' গেলাম একদিন দেশবন্ধু পার্কে। ওমা, এসে দেখছি একদম ফাঁকা। সবুজ ঘাসের সাথে সবুজ প্রাণগুলিও দেখছি অদৃশ্য হয়ে গেছে। একটা কাক কোথা থেকে ছুটে এসে মাথার ওপর কাকা স্বরু করল। ও যেন বলতে চায়, প্রেমিকদের খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, সন্ধ্যাবেলা পার্কে বসে—না হল না—শুয়ে প্রিয়ার কোল বালিশে মাথা রেখে আকাশের দিকে তাকিয়ে ঘাস চিবুবে।

ওদের সাথে ট্রাম থেকে নামলাম; বিশ্বরূপা থিয়েটারে ঢুকলাম—আলামী—হাজির। ওদের পেছন পেছন কাউন্টারেও গিয়ে দাঁড়ালাম। ক্লোজ ভিউ থেকে শট্ নেয়া যাবে। কিন্তু কেস্ কেঁচে গেল; পাঁচ টাকার নীচে টিকিট নেই। নায়ক পিছিয়ে গেল। লেখকও। নায়িকা রীতিমত বিরক্ত। শ'নবার এ্যাটেম্প নেব আবার। নায়িকার বোমশেল—রোজ রোজ ফিরে যেতে পারব না। 'শনিবার' না হলে আমি বিশুদাদের সাথে দেখব—আগে থাকতেই বলে রাখছি।"

এখন কী করবে?"

—চল না হাঁটতে থাকি যেদিক দুচোখ যায়।"

এ কেমন ধারা প্রেম গো বাবা! ট্যাকসি নয়, রেষ্টুরেন্ট নয়, এমনকি ফিরে যাব তবু পাঁচ টাকার টিকিট কাটবে না! ব্যাটা দেখছি কবুতরের কলজে আর ফতুয়ার পকেট স্বর্বস্ব করে প্রেম করতে নেমেছে! নায়িকার জন্যে একটা ছোট্ট দীর্ঘনিঃশ্বাসে প্রেম-কাব্যের পরিণতি ঘটল।

হায় মোর চির পরিচিত 'কফি-হাউস; এখানেও দেখছি হাওয়া পাল্টে গেছে! শুধুমাত্র পোষাক-পরিচ্ছদ-চুল-জুলপি নয়, গল্পের ধারাও আমূল পাল্টে গেছে দেখছি। আঁতেলেকচুয়ালদের উচাঙ্গ সঙ্গীতের আসর আজ আধুনিক সঙ্গীতের জলসায় পরিণত হয়েছে। একেবারে বারোয়ারী পুজোমণ্ডপ! একটি জোড়াকেও আলাদা করতে পারলাম না। পাশের টেবিলের নায়িকাটি তার পাশের জনকেও চড়-চাপাড় মারছে; আবার সামনের জনকেও—ভাবটা যেন 'তোদের দু'জনকেই আমার বশ্যতা স্বীকার করিয়ে ছাড়ব। কোথায় সেই শান্ত, লাজুক লাজুক ভাব!

চৌরঙ্গীর প্রেম বড্ড চলমান—দামী মুভি ক্যামেরা ছাড়া ফটো তোলা

ঝুঁকিল। অনেক কালের পরিচিত রেঁস্তোরায় ঢুকে পড়লাম। এক কাপ চা ও একটি চার্মিনার এর বেশী মূলধন নিয়োগ করতে হবে না। কেবিনের চেষ্টা না করে ওরা পাঁচজনের মাঝখানে একটা টেবিল দখল করল। আমিও ওদের শ্রুতির মধ্যে না পারলেও দৃষ্টির মধ্যে একটা চেয়ার দখল করলাম। চপ-কাটলেট-ফ্রাই-মোগলাই থাকতে শুকনো দু' টুকরো কেক্ খায় চা! একেবারে বে-রসিক! কেক'-এর সাইজও ঠিক অমাবস্যার পরদিন চাঁদের যা হাল হয়। এরপর নাটক আর কিছু অফার করবে না। দুজনেই দেখছি টাকা বার করছে। একটা নাটকীয় মুহূর্তের জন্যে আমি তৈরি হই—আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান—টাসেলএ কে জয়ী হয়, অর্থাৎ দাম মিটিয়ে লজ্জাটা কে দখল করে। ব্যাপারটা আমি সম্পূর্ণ ভুল বুঝলেও, ওদের মধ্যে বোঝাবুঝি ঠিকই ছিল—হিজ হিজ হজ-হজ। ডিশের পুরো পয়সা এমন কি ক্ষেত্র বিশেষে গোটা টাকা বখশিস দেয়া রীতি, যাতে বেয়ারা পাশের মেম সাহেবকে একটা লম্বা-চওড়া সেলাম দেয়। আমার কপালের মত বেয়ারার কপালও আজ মন্দ ওরা ডিসটা চেঁছে-পুঁছে নিয়ে গেল!

'ভিক্টোরিয়া'র প্রেমের প্রতি আমার কোনদিনই তেমন আগ্রহ বা কৌতূহল নেই। ওখানে 'নন্-বেঙ্গলীদের' আড্ডা। এদের প্রেমে রোমান্সের বড়ই ঘাটতি। নায়ক-নায়িকার সম্পর্ক যেন খাদ্য-খাদকের সম্পর্ক। আলা অবধি খেয়েই চলেছে—চা-কেক্-চপ-বাদাম-ফুচকা—তেলমুড়ি-তেলপুড়ি; খাওয়ার শেষ নেই। পয়সা থাকলেই খাওয়ান যায়। কিন্তু শুধুমাত্র খাইয়ে বা খেয়ে প্রেমের সাগর পাড়ি···এমন কথাত শুনিনি কস্মিনকালে!

কলকাতা শহরকে দু' অঞ্চলে ভাগ করলে দেখা যায় উত্তর কলকাতা আদি অকৃত্রিম বা ক্ল্যাসিক; দক্ষিণ ক'লকাতা অপেক্ষাকৃত নবীন যৌবনা; কাজেই রোম্যান্টিক। দক্ষিণ কলকাতার ঝিরঝিরে আবহাওয়ায় রোমান্সের মাত্রা কিঞ্চিতাধিক। একমাত্র লেকই আমাকে উদ্ধার করতে পারে। লেক'-এর সবুজ গাছপালা, সবুজ ঘাস, সবুজ টলটলে জল—সবুজ প্রাণের জন্যে প্রকৃতি স্বয়ং একটা পটভূমি রচনা করে রেখেছে। সুন্দরবনে শিকার পাব না, পুরীর মন্দিরে পাণ্ডা পাবনা, লেক'-এ প্রেমের দৃশ্য পাব না ইত্যাদি উদ্ভট চিন্তা আমার ধাতে সহ্য হয় না। অতএব লেক'-এ এক সন্ধ্যা না কাটিয়ে আমার প্রেম-পরিক্রমার ইতি হতেই পারে না। লেক-এ গেলাম; প্রেমও পেলাম। নিরাপদ

দূরত্ব বজায় রেখে ওদের পেছনের বেঞ্চিতে মড়া মানুষের মত বসে রইলাম। বনলতা সেনের মতই নায়িকা আমার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করল—বুঝিয়ে দিল ধারে কাছে কেউ থাকলে তারই অসুবিধা হবে, ওদের কিছু যায় আসে না।

ওমা, নায়িকা দেখছি সিগারেট ধরায়—বোধহয় নায়ককে ধরিয়ে দিচ্ছে—বেশ বেশ। নায়কও যে আর একটা ধরাল। এবার সিগারেট বদল—বদলের আগে দুজনেই হাতের সিগারেটকে একটা মোটামুটি লম্বা-চওড়া চুমো খেল। এর চাইতে ওরা সত্যিকারে ...ব্যাপারটা কম দৃষ্টিকটু হ'ত।

মনে মনে আওড়াই—আমি খুব বিপদগ্রস্ত—দিদি-ভাই বেশ রসিয়ে রসিয়ে একটু প্রেম কর—আমি তোমাদের কোন অসুবিধা সৃষ্টি করব না। আমাকে একটু সুযোগ দাও—শিল্পী মনের মাধুরী দিয়ে তোমাদের নৈসর্গিক প্রেমকে রোমান্সের বাগানের লাল সুরকির পথ দিয়ে একেবারে ঐশ্বরিক স্তরে পৌঁছে দেব—ধন্য ধন্য হয়ে উঠবে তোমাদের জীবন-যৌবন-প্রেম-ভালবাসা। ওরা সম্ভবত আমার মনের কথা শুনতে পেয়ে ওদের মনের দরজা খুলে ধরল। এরপর আমি যে ক্লোজ-শট্ নিলাম তার নেগেটিভখানা তুলে ধরছি। পাঁচজনের মতামত না নিয়ে প্রিন্ট বা এনলার্জ করবার রিস্ক নেব না।

—তোর ওই লম্বা নখটা দেখলে ভয় হয়; ওটা কাটিসনা কেন?

—ওটা'ত তোর আচমকা আক্রমনের হাত থেকে আত্মরক্ষার অস্ত্র।

—আমি আক্রমন করি তোকে, আর তুই বুঝি ধোয়া তুলসী।

—আমার বয়েই গেছে, যা দুর্গন্ধ তোর গায়ে, পাশে বসতেও ঘেন্না করে!

—বিয়ের পর দুর্গন্ধেই মজতে হবে!

—বিয়ের পর! হোয়াট ডু ইউ মীন।

—কেন? বিয়ের পর মানে বিয়ের পর—মানে আমরা দুজনে যখন বিয়ে...

—দেখ জন্তু...

—আমার নাম জয়ন্ত

—'জন্তু' আমার দেয়া আদরের নাম। আমি এই নামেই ডাকব।

—কেন, আমি কি তোর পোষমানা ঝুনু পোনা?

—তা হলেও বর্তে যেতিস; তুই তারও অযোগ্য। আবার বর হবার সখ। তোকে না হাজার বার বলেছি নিজেকে সিনেমার হিরো ভাবিস না—ওসব ন্যাকামি আমার ভাল লাগে না। তোকে আমি বিয়ে করতে যাব কোন দুঃখেরে?

—বাবে, দুঃখে করতে যাবি কেন। আনন্দে-সুখে আমরা বিয়ে করে নীড় বাঁধব—আমরা দুজন দুজনকে ভালবাসি—প্রেমের পরিণতি বা সার্থকতা বিয়েতে। (নায়িকার একখানা হাত চেপে ধরল)

—ফের ওই সিনেমা আর বস্তাপচা উপন্যাসের প্যানপ্যানানি সুরু করলি। ইউ আর জাস্ট মাই বয় ফ্রেণ্ড। তোর সাথে 'লব' করেছি বলেই তোকে বিয়ে করতে হবে এমন দলিলপত্র লিখে দেইনি। ওসব বিয়ে-টিয়ের চিন্তা ছেড়েদে বলছি। তোকেত বলেইছি, প্রেমের কোন ভবিষ্যত নেই, সে বর্তমানে কেন্দ্রীভূত, বর্তমানেই দ্রবীভূত ; আর বর্তমানটা কতটা আকর্ষণীয় তা নির্ভর করে অ্যাণ্ডারষ্টাণ্ডিং-এর ওপর। (নায়িকা হাত ছাড়িয়ে সিগারেট ধরায়)

— দেখ রত্না তোর এই উল্টাপাল্টা কথা আমার মোটেই ভাল লাগে না। আমরা বিয়ে করব না'ত সারাজীবন এভাবে ভেসে বেড়াব ?

—ভেসে বেড়াব না। আবার তোর মত একটা কলাগাছের ভেলার ওপর নির্ভর করে'ত আর জীবন সমুদ্র পাড়ি দেয়া যায় না—একটা মজবুত জাহাজে চাপতে হবে বুঝলি হাঁদারাম। (নায়ককে একটা ঠ্যালা মারল)

—আমাকে তুই কলাগাছের ভেলার সাথে তুলনা করতে পারলি ?

—এখনত তুই ভেলাও নোস। তুই ইঞ্জিনিয়ারিংএ আদৌ চান্স পাবি কিনা, পেলেও পাশ করবি কিনা ; পাশ করলেও চাকরি পাবি কিনা, কিছুই ঠিক নেই। দেখা গেল বেকার ইঞ্জিনিয়ারের খাতায় নাম লিখিয়ে ক্যা ক্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছিস, কিংবা ব্যাঙ্কের টাকায় স্কুটার-রিকসা চালাচ্ছিস ; কিংবা 'আত্মনির্ভরশীল' বেকার ইঞ্জিনিয়ার প্ল্যাকার্ড টাঙিয়ে ফুটপাতে সারা ব্লাউজের দোকান সাজিয়ে বসেছিস। চাঁদুর আবার বিয়ে করবার সাধ। আধ ডজন ভাই বোনকে মানুষ করবি না নিজে মানুষ হবি। রাগ করিসনা, তোকে আমি বর হিসাবে ভাবতেই পারিনা।

—তুই বা কি এমন একটা রাজকন্যা ·· ?

—রাজকন্যা নয় বলেই'ত একটা শক্ত খুঁটি ধরতে হবে। রাজকন্যা হলে তুই-ত-তুই, ওই বাদামওয়ালার গলায় মালা ঝুলিয়ে দিতাম। অর্ধেক রাজত্ব যখন আঁচলের খুটোয় বাঁধা তখন আর ভয় কি। তোকে ক-অ-বে বিয়ে করে ঘরে নিয়ে গিয়ে পুষতাম। (দুই হাত দিয়ে নায়কের গাল টিপে দিল)

—বিয়ের পরত আমাকে চিনতেই পারবি না—তাই না ?

—চিনতে না পারার কি আছে। আমার বরের সাথে সাদরে তোর আলাপ করিয়ে দেব—আমার এক সময়ের 'বয়-ফ্রেণ্ড'; বিয়ে বিয়ে করে আমায় বড্ড 'বোরডা করত। ভক্ত—ইউ আর রিয়েলি এ বোর। নে এখন ওঠ, আমার একটু তাড়া আছে।

—আচ্ছা রত্না, তোর যদি সেরকম বর না জোটে?

—বয়েই গেল; বিয়ে করব না; বিয়ে না করেও দিব্যি কাটান যায়; একমাত্র জ্যান্ত ও আইনসিদ্ধ সন্তান ছাড়া কোন কিছুর অভাব নেই। নে এখন চটপট উঠে পড়। (নায়িকা সত্যি সত্যি উঠে দাঁড়ায় ও শাড়ি ঠিক করে)

—শঙ্করিতে কফি খাওয়াবি বলেছিলি? খাওয়াবি না?

—সেই জন্যেই'ত বলছি তাড়াতাড়ি উঠে পড়, নইলে আমার দেরি হয়ে যাবে। তবে কফি ছাড়া আজ আর কিছু খাওয়াতে পারব না বুঝেছ চাঁদু।

লেখক তুমিও উঠে পড়। তোমার ক্যামেরায় অনেকটা শট্ নিয়েছ। কিন্তু আধুনিক প্রেমের গল্প নৈবচ নৈবচ—তোমার ক্ষমতার বাইরে। জেনারেশন গ্যাপ। তোমার উপলব্ধিতে কড়া পড়ে গেছে। তুমি অনেক পিছিয়ে আছ। প্রেম চিরন্তন, অবিনশ্বর; কিন্তু যুগে যুগে তার রূপ পাল্টায়—নিজের চোখেই দেখলে—এ প্রেম সে প্রেম নয়, সে প্রেম হয়েছে বাসি। প্রেমের দেবতা পরাভূত নয়, পরাভূত তুমি শর্মা, আর তোমার কলম। তোমার জীবনবোধ হেজে-মজে পচে গেছে। সামান্য বকুল ক্যামেরায় চলমান জীবনের ছবি তোলার স্পর্ধা করলেই কি ছবি তোলা যায়। অতএব বৎস, সময় থাকতেই সম্পাদকের শ্রীচরণে 'সারেণ্ডার' কর।

গল্প দিতে না পারলেও কাউটা দিতে আপত্তি কোথায়। রোজকার মত বাড়ি ফিরে জামা-জুতো খুলে, এক গ্লাস জল-পান করে বিড়ি ধরাতে গিয়ে বিড়ির কৌটায় একখানা চিরকুট পাওয়া গেল। এই বিড়ির কৌটার তত্ত্বাবধানের দায় দায়িত্ব শ্রীমান তারক চন্দ্রের—'টক-লেভেল' যেন মারাত্মক ভাবে কমে না যায়!

চিরকুট খানা লিখেছেন স্বয়ং তারকচন্দ্র!

"শ্রীশ্রীচরণেষু দাদাবাবু, মলিনার ভারি বিপদ। আমি ছাড়া ওর আর কেউ নেই। মলিনা আমাকে বড়ই ভালবাসে। মলিনাকে নিয়ে চলে যাচ্ছি। আজ ওকে আমি কালীঘাটে বিয়ে করেছি। আপনি আমার শতকোটি প্রণাম নেবেন—ইতি—আপনাদের তারক।"

প্রেম

সরসী সরকার

বিখ্যাত কবি আমার কথায় মুচকি হাসলেন, কয়েকবার মাথা ঠুকলেন। বললেন, প্রেম মস্ত বড় কথা, এত সহজেই ওর ব্যাখ্যা চলে না।

চুপ করে রইলাম।

পড়াশুনো করো বুঝতে পারবে। বায়রণ, কীট্‌স্ ব্রাউনিং যার নাগাল পেতে হিমসিম সে প্রেম এত তাড়াতাড়ি বুঝবে কী করে?

একটু নিঃশ্বাস নিলেন কবি। কিছু একটা ভাবলেন। পরে লাজেসন দিলেন রবীন্দ্রনাথ পড়তে।

এবার গেলাম দার্শনিকের কাছে। বয়সের ভারে নত, মাথায় পাকাচুলের সমারোহ। প্রতিটি কথাবার্তায় জ্ঞানের প্রকাশ। তিনি বললেন, প্রেমের ব্যাখ্যা হয় না। প্রেম প্রেমই। এ হল অনুভবের জিনিস।

অবাক বিস্ময়ে তাকালাম দার্শনিকের দিকে।

হ্যাঁ, জীবনকে জানো আগে তবেই প্রেমকে খুঁজে পাবে। জীবনের সঙ্গে প্রেমের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। ফিলজফি অব লাইফ অ্যাণ্ড-লাভ-এর ওপর অনেক বই আছে পড়ে দেখতে পারো।

সন্তুষ্ট হতে পারলাম না। ফিরে এলাম। মনে শুধু একই প্রশ্ন, প্রেম কী?

এরপর এক ঐতিহাসিকের দরবারে।

তিনি বললেন, ভারত সম্রাট সাজাহানের জীবনই প্রেমের নিদর্শন। ইতিহাস পড়ো, প্রেমের অনেক ঘটনা জানতে পারবে। প্রেমের সংজ্ঞা পরিষ্কার হয়ে যাবে।

আমি কোন উৎসাহ পেলাম না।

ঐতিহাসিক ভদ্রলোক গম্ভীর হলেন। আমার সঙ্গে কথা বলে আর তার মূল্যবান সময় নষ্ট করতে চাইলেন না।

কয়েকদিন পর এক খ্যাতনামা সাহিত্যিকের কাছে হাজির হলাম। তিনি বললেন, বিবেকানন্দের বই পড়ো, আধ্যাত্মিক প্রেমের ব্যাখ্যা খুঁজে পাবে।

আমার লাইব্রেরী কম বই-এ ভরে উঠেছে। জন কীট্‌স, রবীন্দ্রনাথ, ব্রাউনিং বায়রণ প্রভৃতি কবিদের ক্রিয়েশন জোগাড় করেছি। ফিলজফি অব লাইফ

অ্যাণ্ড লাভ-এর ওপর যত বই পেলাম কিনেছি। ইতিহাসও সংগ্রহ করেছি খান পনেরো। বিবেকানন্দের লেখা কোন বই বাদ দিইনি। সব মিলিয়ে শ দুয়েক বই টেবিলে সাজিয়ে পড়তে বসেছি। কেননা, প্রেমের ব্যাখ্যা আমাকে পেতেই হবে।

কয়েকদিন কেটে গেল। একটার পর একটা বই পড়লাম। লাভ কিছু হল না। এ বই থেকে ও বইতে শুধু লাফালাফি সার। প্রেমের হদিশ পেলাম না।

অবশেষে ক্লান্ত হয়ে টেবিলে মাথা রেখে চোখ বুজিয়ে রইলাম। আমার মাথার তিনদিকে বই-এর পাহাড়। আমাকে দেখা যাচ্ছে না।

হঠাৎ একটা বিশ্রী দুর্গন্ধ নাকে এল। গা বমি বমি করে উঠল। ধড়ফড় করে মাথা উঁচু করলাম, জানালার দিকে তাকালাম।

জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে এক ভিখেরী, মাথায় ঝাঁকা। ভিক্ষে চাইছে।

উঠে দাঁড়ালাম। জানালার কাছে গিয়ে বললাম, তোর ঝাঁকায় কী আছেরে? দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে?

ও চুপ করে রইল, মাথা নিচু করে।

আমি রেগে গিয়ে বললাম, পচা, দুর্গন্ধ জিনিস নিয়ে বাড়ীতে ঢুকেছিস। দাঁড়া, মজা দেখাচ্ছি।

পচা কিছু নয় বাবু। এতো আমার বৌ। গত পাঁচ বছর ধরে একে নিয়ে এভাবে ঘুরছি।

বৌ! অবাক হলাম। নামা দেখি।

ও ঝাঁকা নামালো। কাপড় সরাতেই দেখতে পেলাম এক গলিত কুষ্ঠ রোগিনীকে। পিটপিট করে আমাকে দেখছে। কোন দুঃখ, বেদনা নেই। চোখে মুখে খুশী খুশী ভাব।

আমি নাকে হাত চাপা দিলাম।

পিছন ফিরে বই-এর স্তূপের দিকে একবার তাকালাম।

তারপর আর দেরী না করে সব বই আলমারির ভিতর তুলে রাখলাম।

যে ফুল না ফুটিতে

দীনেশচন্দ্র সিংহ

সরকারী অফিসের ছ্যাকড়া কেরাণী সুনীলকুমার রায়। চল্লিশের কাছাকাছি বয়স। অফিসে বেরোবার সময় তার 'ওগো শুনছো' কে একবার ডাকবে। ছেলেমেয়ে দুটিকে নানা অছিলায় বাইরে পাঠিয়ে অমলা কাছে এসে দাঁড়ায়। সাংসারিক কথাবার্তা ও লেনদেন শেষ হলেও প্রয়োজনাতিরিক্ত কিছু প্রাপ্তির আশায় অমলা আশেপাশে ঘুরঘুর করে। তখন সুনীল একদৃষ্টে তার মুখের দিকে তাকিয়ে হারিয়ে যাওয়া শান্তার অস্পষ্ট মুখচ্ছবি খুঁজে পেতে চায়। সলজ্জ হাসি হেসে অমলা জিজ্ঞাসা করে—পুরনো ত হয়ে গেলাম; তুমি এখনো আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কি ভাব বলতো?

—ক্ষ্যাপা খুঁজে ফেরে পরশ পাথর। সুনীল সংক্ষিপ্ত কাব্যিক জবাব দেয়।

—হ্যাঁ, তুমি ক্ষ্যাপাই বটে! অমলার সতৃপ্ত উত্তর।

ঠিক এমনি প্রশ্নই তাকে করেছিল, শান্তা। অনেক বার। অনেক বছর আগে। সুনীলের কাঁধে আলতো হাত রেখে পঞ্চদশী শান্তা জিজ্ঞাসা করতো—সুন্দা, তুমি আমার মুখের দিকে চেয়ে কি দেখ বলতো?

তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে জোর কদমে। কামান বন্দুকের আওয়াজ কানে না এলেও বাংলা দেশের এক অখ্যাত গ্রাম নয়নপুরের আকাশে বাতাসেও বারুদের গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে। কয়দিন ধরেই সুনীল বাড়ীর বড়দের মুখ একটু ভার ভার দেখছিল। তাদের বাড়ীর পশ্চিম ভিটেয় ছিল একখানা টিনের চৌচালা। ও ঘরে আউশ ধানের আঁটি ও ভিজে পাটা রাখা হতো বর্ষায়। সুপারী পচানো হতো শরৎ হেমন্তে। নারকেল জোড়া বেঁধে বাঁশে ঝুলিয়ে রাখত সারা বছর। ঘরের এক কোনে ভাঙা তক্তপোষে রাত কাটাত বাঁধা মাহিন্দার সুবল, কখনো কখনো জনাব আলী।

একদিন সে ঘর থেকে জিনিষপত্র সরানোর ধুম পড়ে গেল। কর্তাদের

কথাবার্তায় বোঝা গেল কলকাতা থেকে কারা যেন আসছে। ঐ ঘর নাকি তাদের। মালিকের নাম কেশব দাস। এতদিন মালিকের অনুপস্থিতিতে সুনীলেরা গোলাঘর হিসেবে ঘরখানা ব্যবহার করছিল।

দীর্ঘ বৎসরের ব্যবধানে মালিক ফিরে আসছে। তাই কোথায় সুপারী ও ধানের গোলা হবে, পাটের স্তূপ কোথায় সরানো হবে, সুবলই বা রাতে কোথায় শোবে তা নিয়ে বাড়ীতে হৈ চৈ ও বিরক্তি।

সুনীলের ঠাকুর্দা প্রতি বছর চর অঞ্চলে বর্গা জমির ধানের অংশ আনতে যেতেন। একবার সেখান থেকে ফেরার সময় তিনি মা বাপ মরা একটি ছেলে নিয়ে আসেন। চরবাস কালে তিনি ওদেরই ঘরে খেতেন থাকতেন। ছেলেটির মা বাপ সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে ভেসে যায়। ঠাকুর্দা তাকে বাড়ীর ফাইফরমাস ও রাখালীতে নিযুক্ত করেন—বয়ঃপ্রাপ্ত হলে নিজে উদ্যোগী হয়ে বিয়ে দেন এবং একখানা টিনের ঘর ও কিছু জায়গা জমি দান করে যান। তারই ছেলে কেশব। সাংঘাতিক ডানপিটে ও চঞ্চল স্বভাবপন্ন। একদিন দুত্তোর বলে সব ছেড়ে ভাগ্যান্বেষণে বেরিয়ে যায়। কারণ, কোমর জলে হাল ঠেঙানো আর জউলা জোঁকের কামড় খাওয়া তার পোষাবে না। পরে সুনীল শুনেছে তার বাবা কাকাদের সঙ্গে কেশববাবুর বাবার অবয়বিক সাদৃশ্য লক্ষ্য করে অনেকে তার ঠাকুর্দার চরিত্রের ওপর কটাক্ষ করতো।

প্রবাসে কাজ কারবার করে কেশববাবু ভালই ছিলেন। সামান্য বিষয় সম্পত্তির লোভে তিনি পুণরায় দেশে পাড়ি জমাবেন না এ সম্পর্কে এক রকম স্থির নিশ্চয় ছিলেন বাড়ীর সবাই। কিন্তু যুদ্ধ সুরু হতেই যে তারা একেবারে লশরীরে হাজির হবে বলে পত্রাঘাত করে বসবে, এতটা ভাবেন নি কখনো। সুতরাং তড়িঘড়ি তাদের ঘরদোর পরিষ্কার করে ফেরৎ দেবার ব্যবস্থা হলো।

একদিন বিকেল বেলা স্কুল থেকে বাড়ী ফিরে সুনীল দেখে বাড়ী বেশ গরগরম। তাদের বাড়ীর উদালা কালোকোলো ছেলেমেয়েদের মাঝে খেলে বেড়াচ্ছে কয়টি সুন্দর জামা কাপড় পরা ফুটফুটে ছেলেমেয়ে। একখানা জল-চৌকির উপর বসে বাবা ও কাকাদের সঙ্গে কথা বলছেন এক হৃষ্টপুষ্ট চল্লিশোর্ধ ভদ্রলোক। মা ও কাকীদের সঙ্গে আলাপ রত জনৈক ভদ্রমহিলা। তারই গা

ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল একটি এগার বার বছরের ফুটফুটে মেয়ে। সুনীল বুঝলো সপরিবারে কেশববাবু এসে গেছেন।

বিকেলে স্কুল ছুটি হতেই সহপাঠীদের সঙ্গে কলকল করতে করতে চৈত্র বৈশাখের ধান-পাট ক্ষেতের চোখা ডেলা মাড়িয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে বাড়ী ফেরে সুনীল। দারুণ ক্ষুধায় পেট জ্বলে তখন। ঘরে ঢুকে বই খাতা ও গায়ের জামা ফেলেই রান্নাঘরে দৌড়—এই তার নিত্যকার অভ্যাস। সেদিন বাড়ীর ভিতর পা দিয়েই থমকে দাঁড়াল সে। প্রথম ভ্যাবাচ্যাকা ভাব কেটে যেতে ঘরে ঢুকে ধীরেসুস্থে বইপত্র রেখে দিল। আর কানখাড়া করে রইলো বাইরের দিকে। শুনতে পেল কেশববাবুর জিজ্ঞাসার উত্তরে তার বাবা বলছেন—হ, ও আমাগো বড় শ্রীমান। ক্লাশ এইটে পড়ে। আর গুলান ত অখনো বর্ণ শিক্ষা বাল্য শিক্ষাই শেষ করবার পারে নাই। পড়বার যাবে কোথা?

কেশববাবু—হুঁ, কি যে অইলো। কাল যুদ্ধ লাইগ্যা বড় মাইয়াটার পড়াশোনা নষ্ট কইরা দিল। শাস্তাটা লেখাপড়ায় খারাপ ছিল না। কিন্তু গেরামে মাইয়াদের ত কোন ইস্কুল নাই।

সুনীলের ছোট কাকীকে উদ্দেশ করে তার মা বললেন—হ্যালো ছোট বৌ—সুইন্যারে দুগা ভাত দিয়া আয়। ইস্কুল থুন আইছে। অন্য দিন হইলে এতক্ষণে হাঁড়ি মাথায় করতো। আইজ মনে লয় লাজে ঘর থুন বাইরে আইতেছে না।

মা তার মনের ভাব বুঝেছেন। রান্নাঘরের দরজা খোলার শব্দ পেয়েই সে মাথা নিচু করে সেদিকে পা বাড়াল। এক পলকে দেখে নিল ভদ্রমহিলা ও তার কন্যা তার দিকে সকৌতুকে চেয়ে আছে।

সুনীল ভাত খেতে খেতে শুনতে পেল ভদ্র মহিলাকে তার মা বলছেন—আছে লো ভইন আছে, পড়াশোনায় মাথা আছে। শত্তুরের মুখে ছালি দি কই, সব ক্লাশে ফাস্ট অইয়া উঠে। মাষ্টর রাখন লাগে না।

খাওয়া শেষে পুকুরে মুখ ধুয়ে দীঘির পাড়ে কালীগাছ তলায় চলে গেল সে। অন্যান্য খেলার সাথীরাও এসে গেছে। কিন্তু সেদিন খেলার দিকে কারো মন নেই। যুদ্ধের দরুণ বাজারে কাগজের অভাব। সুতরাং প্রথম সাময়িক পরীক্ষা হবে না—প্রধান শিক্ষকের এই নোটিশ পেয়ে সকলের মন খারাপ। একটু আগে মাথার উপর দিয়ে এক ঝাঁক এরোপ্লেন উড়ে গেল। কে ক'খানা

শুনেছে তা নিয়ে কিছুক্ষণ হৈ চৈ। অবশেষে সুনীলদের বাড়ীতে নবাগতরা আলোচ্য বিষয়।

সন্ধ্যায় উঠোনে দাস-ঘোষ-পাল-দে-দত্ত বাড়ীর অনেকেই হাজির। সারা-দিন জন মজুর খাটুনির পর রাজিদ জব্বর মজিদ এরাও বাড়ী না গিয়ে কেশব দাসের মুখে কলকাতা থেকে নিয়ে আসা যুদ্ধের অনেক অজ্ঞাত ও অবোধ্য কাহিনী শুনছে। সেসঙ্গে পান চিবনো ও তামাক পোড়ানো চলছে সমানে। কারো কারো কৌতূহলী প্রশ্ন ও বিস্ফোচিত মন্তব্য।

বাড়ীতে বেশ উৎসব উৎসব ভাব। রান্না ঘরে মেয়েদের বকবকম্, কাটনা বাটনার খস্‌খস্ ঝন্‌ঝন্ শব্দ। ছেলেরা পড়ার পাট চুকিয়ে গল্প শুনছে সেদিকে কারো খেয়াল নেই। অন্যদিন এতক্ষণে ছোটকাকার গর্জনসহ চড়-চাপড়ের বান ডাকতো ছোটদের গালে পিঠে, আর বাক্য বরিষণ হতো সুনীলের ওপর— বড় পণ্ডিতের আর কি! কেলাসে ফাস্ট অইছে, হেই গুমানে বাঁচে না। আর পড়ালেখার কাম কি? হাতাগুলি মারলেই চইলবো। দেখুম আগামী বারে পাশ করে না দিগ করে। সেদিনের সান্ধ্য আসরে সেই ছোট কাকারই সব চেয়ে জোর গলা। যুদ্ধে জাপান ও জার্মানী যে নিশ্চিত জিতবে সে বিষয়ে তার তিলার্ধ সন্দেহ নেই এবং এর বিপরীত ঘটলে তার হাতে যে লোম গজাবে তা তিনি সকলকে দেখাবেন।

দু'চার দিন কেশববাবুরা সুনীলদের ঘরেই খাওয়া দাওয়া করলেন। নিজেদের রান্নাঘর তৈরী হতে এক শুভ দিনক্ষণ দেখে তারা আলাদা হাঁড়ি চাপালেন। সেদিন বাড়ীর সকলের নিমন্ত্রণ তাদের ঘরে। কেশববাবুকে কাকা এবং তার স্ত্রীকে নতুন কাকী বলে ডাকতে ইতিমধ্যে মা বলে দিয়েছেন সুনীলকে।

স্কুল থেকে ফিরতেই নতুন কাকী ডেকে বললেন—সুনু আমাগো ঘরে আয়। ওদের রান্না ঘরে ঢুকে দেখে মা মেয়ে দু'জনেই তার খাবার জোগাড়ে ব্যস্ত। শান্তা পিঁড়ি পেতে জলের গ্লাস এগিয়ে দিল। কাকী বড় থালায় ভাত এবং বাটি বাটি করে ছ' সাত রকম তরকারী ও পায়েস থালার চারপাশে সাজিয়ে দিলেন।

সুনীল মাথা নিচু করে খাচ্ছিল। শান্তার মা বললেন—দেখতো বাবা, পাখির মতন কোথা থিকা কোথা উইড়া আইলাম। কতবার তোর কাকারে

কইছি—চলনাগো তোমার দেশের বাড়ী দেইখ্যা আসি। আইজ কাইল কইরা আর অইয়া উঠে না। ভগবান বলে রাখ, দেশের বাড়ী দেখামু ভালা কইরা। কিন্তু আমার কষ্ট লাগে মাইয়াটার জন্য। ওর লেখাপড়া বন্ধ অইলো। লেখাপড়ায় ভালাই আছিল মাইয়াটা। এখন যদি বাড়ীতে নিজে নিজে চেষ্টা কইরা যায়। তুইও আছিস্। কিছু কিছু দেখাইয়া শুনাইয়া দিতি পারবি ত?—এই বলে শান্তাকে বললেন—শান্ত, তোর সুধুবার কাছে সকাল বিকাল কিছু কিছু জাইনা নিস্। পড়াশোনার চর্চা থাক। তা না অইলে ভুইল্যা যাবি সব। যদি আবার সুদিন আসে—

সুনীল এই প্রথম সরাসরি শান্তার দিকে তাকাল। ফ্রক পরনে, হাত পা গুলি গ্রাম্য মেয়েদের তুলনায় একটু সরু সরু। মাথায় কোঁকড়ানো চুল দুভাগে বিনুনী করে বাঁধা। টানা টানা চোখ। মায়ের মতনই ফিনফিনে গড়ন। গ্রামের মেয়ে হলে এদ্দিনে শাড়ী ধরতো।

দুই পরিবারের মধ্যে অপরিচয়ের সংকোচতা অলক্ষ্যে কেটে যেতে লাগল। বড়রা বড়দের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিলেন, ছোটরা নিজেদের মধ্যে অবাধে মিশে গেল। কেশব কাকা বাজারে একটা মনোহারী দোকান খুলে বললেন। বাড়ীর কর্তাদের বললেন—আমি বিষয় সম্পত্তির ভাগ চাই না। চাষবাস আপনারা যেমন করছিলেন, করেন। ইচ্ছা হয় খই মুড়ী চিড়ার জন্য কিছু ধান চাল ধইরা দিবেন। তবে পুকুরের মাছের ভাগ ছাড়তে পারুম না। যা ধরতে পারুম তাই খামু। কর্তারা তাতেই সানন্দ সম্মতি দিয়েছিলেন।

শান্তা কলকাতা থেকে অনেক শিশু পাঠ্য গল্প-উপন্যাস, রোমাঞ্চ ও ভৌতিক সিরিজ এবং গোয়েন্দা কাহিনীর বই নিয়ে গিয়েছিল। এত দিন রামায়ণ, মহাভারত, শনি-লক্ষ্মীর পাঁচালীই ছিল সুনীলের পাঠ্য-বহির্ভূত বিষয়। হঠাৎ শান্তার কাছে বিভিন্ন রংচঙের গল্পের বই পেয়ে সুনীলের কল্পনা প্রবণ মনের যেন হঠাৎ পাখা গজাল।

লেখাপড়া ছাড়া আর তিনটি কাজে সুনীল বিশেষ আসক্ত ছিল। হরেক রকম যন্ত্রপাতি দিয়ে মাছ ধরা, বাড়ীর সকলের গাছের ভাল ফলটি যেনতেন প্রকারেণ হস্তগত করা; আর ভোরে ফুল তোলা ছিল তার অন্যতম কাজ। এতদিন এ কাজে তার সঙ্গী বা ভাগীদার কেহ ছিল না। বাড়ীর বাচ্চাদের সঙ্গে তার বয়সের বেশ খানিকটা তফাৎ। ওদের এসব কাজের অংশীদার করা

চলে না। তার এই সব ব্যক্তিগত এলাকায় আস্তে আস্তে শান্তার অনুপ্রবেশ ঘটল—বিশেষ করে ফল কুড়ানো ও ফুল তোলা কাজে।

বাড়ীর ছোটরা তাকে বড়দা বলতো। 'আপনি' বলে সম্বোধন করতো। ভয়ে কাছে আসতে চাইত না। বড়রা তাকে 'তুই' ও 'সুইন্যা' বলেই ডাকতেন। কিন্তু এই নবাগত পরিবারের সবাই তাকে যেন একটু পৃথক দৃষ্টিতে দেখলেন। সুনীলের বিকৃত অপভ্রংশ 'সুইন্যা' না বলে তাকে সাদর-সংক্ষেপে 'সুনু' বলে ডাকত নতুন কাকা ও কাকী। ছেলেমেয়েরা ডাকতো 'সুনু দা' এবং 'তুমি' বলে। এরকম সম্বোধন তার বাড়ীতে এই প্রথম।

পড়াশোনা, ফুল তোলা, ফল কুড়ানো এই সব দৈনন্দিন কাজের মাধ্যমে সুনীল ও শান্তার মধ্যে ক্রমে একটা পরস্পর নির্ভরতা ও নৈকট্য গড়ে উঠেছিল। এতদিন সুনীল ছিল এসব কাজে একক ও নিঃসঙ্গ। এখন সুনীলের অগোছাল বইগুলি শান্তাই গুছিয়ে রাখে। পেন্সিল হারালে শান্তাকে খুঁজে দিতে হয়। একটা ফল পেলে তাকে দু' টুকরো করে কেটে শান্তাকে দেয়। সুনীল শিউলী গাছে উঠে ঝাঁকুনি দেয়, শান্তা তলা থেকে ফুল কুড়িয়ে সাজি ভরতি করে, গন্ধরাজের ও স্থলপদ্মের ডাল নুইয়ে ধরে, শান্তা টপাটপ ফুলগুলি ছিঁড়ে নেয়। ডালের কোঁদায় শান্তাকে নিয়ে খালে বা ধানক্ষেতের ফাঁকে ফাঁকে বাইতে থাকে সুনীল; শান্তা টপ্‌টপ্‌ করে সাপলা তোলে। কলকাতার বাসা নামধারী খাঁচা থেকে মুক্ত বিহঙ্গের মতো নীল আকাশের নীচে সবুজ তরুলতার মাঝে, স্বচ্ছ জলের উপরে সুনীলের সঙ্গে এক নূতন জগতের সন্ধান পেল যেন শান্তা—যার সরসতা সজীবতা শ্যামলীমা তার আপাদমস্তকে কোমল হাত বুলিয়ে দিল।

শান্তার মেধা ও বুদ্ধি দুই-ই ছিল। সুনীলের বার্ষিক পরীক্ষা হয়ে গেলে শান্তা তার বইগুলি নিয়ে যেত। বইয়ের মলাটে শ্রীসুনীল কুমার রায় নামটি কেটে উপরে বা নীচে লিখত কুমারী শান্তা দাস। সুনীল ক্রমে অষ্টম ও নবম শ্রেণী অতিক্রম করে দশম শ্রেণীতে উঠল। সুনীলের মুখে দাড়ি গোঁফের সুস্পষ্ট রেখা। ভরাট গলা, চলাফেরায় কিছুটা ভারিক্কিয়ানা পুরুষালি ভাব। আঁটি-কলাগাছের মতো সে হঠাৎ লকলক করে অনেকটা বেড়ে গেল। শান্তার শহরে ছিপছিপে গড়নে মোটা ভাত ও অ্যাস্ত মাছের ঝোলের গুণে প্রথম বর্ষায় শুষ্ক শীর্ণ খালবিলের মতো ক্ষীয়মানদেহ ক্রমেই কানায় কানায় ভরন্ত পুরন্ত হয়ে উঠল।

বর্ষায় তারা দুজনে নৌকা বেয়ে নালেখালে ঘোরে। শান্তার কত প্রশ্ন। শালুক ফুল সাদা নীল গোলাপী এত রঙের কেন? মনোহরা, নয়ন তারা, রঙের গুঁড়া, ফুলবাদাম—ধানের এত সুন্দর নাম ত শুনিনি! তিতাস, চন্দনা, মোহিনী নদীর এরকম মিষ্টি নাম কে রেখেছে। ডাকাতিয়া নদীতে কি খুব ডাকাতি হয়? হরিণ বিবির খাল, রঞ্জন বিবির পুল যাদের নামে সেই বিবিরা কারা? পুঁটি মাছে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে সিঁদুরের দাগ পড়ে কেন? পুকুর ঘাটে নামলে জলে ছায়া পড়ে; জল নাড়া দিলে সেই ছায়া কিম্ভূতকিমাকার রূপ ধরে—নাচানাচি করে কেন? হাসগুলি শীতের ভোরে ভরভর করে জলে নামে,—ওদের কি শীত করে না? —ইত্যাদি প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে সুনীল প্রাণান্ত।

নবম শ্রেণীতে ওঠার পর থেকেই সুনীলের ভাবনাচিন্তার গতানুগতিক ধারায় কিছুটা এলোমেলো ভাব। স্কুল ছুটির পর পা দুটি যেন একটু তাড়াতাড়িই বাড়ীর দিকে চালিত হয়। মাছ ধরা, ফল কুড়ানো, খেলাধুলার ফাঁকে ফাঁকে শান্তার কথা, তার ছবি মনে একটু চমক, একটু দোলা দিয়ে যায়। শান্তা কখন পড়তে আসবে সে পদশব্দের জন্য কান দুটো খাড়া হয়ে থাকে। তার হাতে হাত ঠেকলে আঁচলের ছোঁয়া লাগলে খাতা কলম হাতে নিলে কেমন এক রকম শিহরণ জাগে শরীরে; যা আগে কখনো হতোনা।

শান্তাদের ঘরে বিশেষ কোন খাবার তৈরী হলে সুনীল তার অংশ পেত অবশ্যই। তাছাড়া শান্তা আঁচলের আড়ালে লুকিয়ে নাড়ু, মোয়া, ইত্যাদি এনে বলতো—সুনুদা হাঁ করতো, চোখ বোঁজ তো। এই বলে তার হাতে মুখে সব গুঁজে দিত। সুনীল বলতো—কাকীত একবার খাওয়ালেন, তুমি আবার আনতে গেলে কেন? তোমার ভাগের থেকে দাও নি ত?

—দিলামই বা। তুমি তোমার চুপড়ি থেকে বড় বড় আম, আতা, পেয়ারা গুলি আমার হাতে গুঁজে দাও কেন?

—তোমাকে দিতে ভাল লাগে বলে। তোমার মুখে যে হাসি ফুটে ওঠে তার দাম ফলের দামের চেয়ে অনেক বেশী।

—ওমা, ভেতরে ভেতরে এত। আর তোমার কাছে আসছি না। এই চললাম।

শান্তা ঘরের দরজার দিকে পা বাড়াতেই সুনীল খপ্ করে তার আঁচল ধরে

ফেলল। ওকে কাছে টেনে এনে ওর চুল নিয়ে খেলা করলো, কপালে মুখে বার বার আলতো হাত বুলিয়ে দিল, দুহাতে ওর মুখখানা তুলে ধরে বললো—তুমি দিন দিন ভারী সুন্দর হচ্ছ শান্তা।

সুনীলের এরকম আচরণে হতচকিত শান্তা ফিস্ ফিস করে উঠল—ছাড় সুহৃদা, ছাড়, কেউ দেখতে পাবে।

সুনীলের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে শান্তা এক রকম দৌড়ে নিজেদের ঘরে চলে গেল। সারাদিন আর সুনীলের কাছে ঘেঁষল না। পরদিন পড়ার ঘরে ঢুকে দূর থেকে খাতা পেনসিল এগিয়ে দিয়ে বললো—এল্‌জাব্রার ফরমুলাটা বুঝি না। সুনীল শান্তার মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক হল।

চব্বিশ ঘন্টার ব্যবধানে শান্তার মুখাবয়বে কি পরিবর্তন! মুখ শুকনো, চোখগুলি টলটলে, মাথার চুল উস্কোখুস্কো। সুনীল জিজ্ঞাসা করলো—তোমার কি হয়েছে শান্তা? শরীর খারাপ?

—কি হয়েছে তুমি জান না? কাল ওরকম করতে গেলে কেন? আমি সারারাত ঘুমুতে পারিনি। শান্তার চোখের জল টপটপ করে ঝরতে থাকে। অবাক সুনীল এই কান্নার কোন অর্থ খুঁজে পায় না।

কিছুদিন পর কাল-বৈশাখীর ঝড় উঠতেই দুজনে চুপড়ি হাতে সিন্দুরে আমগাছ তলায় ছুটে গেল। ততক্ষণে শিলাবৃষ্টি সুরু হয়ে গেছে। ওরা চুপড়ি মাথায় দিয়ে মোটা আমগাছের গুড়ির আড়ালে বসে জল ও শিলাবৃষ্টি থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করলো। টুপ করে একটি আম পড়ল ওদের সামনে। গাছ-পাকা হলদে রঙের ওপর লালের ছোপ লাগা আমটির সদ্যছিন্ন বৃন্তমূল থেকে তখনো রস গড়িয়ে পড়ছে। গায়ে দু'একটা বৃষ্টির ফোঁটা। আমটি হাতে নিয়ে শান্তা বললে— কি সুন্দর আমটা দেখতো।

সুনীল ওর হাস্যোজ্জ্বল মুখের দিকে তাকিয়ে বললো—ঠিক তোমার মুখের মতো। সেদিন যখন কাঁদছিলে তখন তোমাকে ঠিক এরকম দেখাচ্ছিল।

—তুমি আজকাল বড় ফাজিল হয়েছ।

—কেন, কি করেছি?

—যখন তখন আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কি দেখ বলতো।

—কখন?

—কখন আবার? আমি অঙ্ক নিয়ে মাথা ঘামিয়ে যখন মরি তখন।

কোথায় একটু বলে দিয়ে তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেবে তা নয়, কেবল শক্ত শক্ত অঙ্ক দিয়ে আমাকে সামনে বসিয়ে রাখার মতলব। আর হাঁ করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকা। এখন থেকেই পাকামি।

—ভাল লাগলে তাকাবো না?

—ভাল লাগাচ্ছি, বাহী চল। সব বলে দেবো। এই বলে তার আঁচলের প্রয়োজনাতিরিক্ত অংশটুকু দিয়ে সুনীলের বৃষ্টিভেজা পিঠ ঢেকে দিতে দিতে বললো—আরো সরে এসে বসো: একেবারে ভিজে গেলে যে।

আর একদিন সুনীল জ্যামিতির খাতায় আনমনে শান্তার নাম লিখে তার ওপর কলম বুলিয়ে যাচ্ছিল বার বার। চুপি চুপি পা ফেলে শান্তা সুনীলের পেছনে দাঁড়িয়ে এই কাণ্ড দেখে তার চোখ টিপে ধরে। সুনীল আলগোছে শান্তার কোমর জড়িয়ে ধরার উপক্রম করতেই সে তাড়াতাড়ি চোখ ছেড়ে দিয়ে বললো—এসব কি করছো বলতো। এবারে কি আমার নাম লিখে পরীক্ষায় ফার্স্ট হবে? কারো হাতে এই খাতা পড়লে কি ভাববে তারা। এরকম পাগলামী করলে আর কখখনো তোমার সামনে আসবো না।

ইদানীং সুনীলের ঘরে বেশীক্ষণ বসলেই শান্তার মার ডাক আসে—ও ঘরে বসে সুহুর পড়া নষ্ট করিস না। সুনীলের মাও তাকে মাঝে মাঝে বকেন—কেবল শান্তার সঙ্গে বকর বকর করিস, পড়িস কখন ক' দেহি। আসলে কোন পক্ষেরই ইচ্ছা নয় ওরা বেশীক্ষণ একা একা থাকে। শান্তা মাঝে মাঝে আক্ষেপ করে বলতো—শহরে থাকলে তোমার সঙ্গে কত খোলাখুলি মেলামেশা করতে পারতাম। এখানে চারিদিকে কেবল চোখ রাঙানি। এখন শান্তার আম জাম কুড়ানো নিষেধ। পেয়ারা জলপাইয়ের খোঁজে সুনীলের সঙ্গে ঘুরঘুর করা বারণ। নৌকায় উঠে শাপলা তোলাও মানা। শান্তা অনুযোগ করে—সুহুদা, তোমার সঙ্গে কতদিন বাইরে বেরুই না। মনে মনে খুব ইচ্ছা করে কোঁদা বেয়ে মাঠে মাঠে ঘুরি, আর তুমি লগি ঠেলতে ঠেলতে গুণ গুণ করে গাইবে—পীরিতের আগুন জ্বালাইয়া দিয়া বন্ধু, নিভাইয়া গেল না···

শান্তা পনেরয় পড়লো। তার বিয়ে নিয়ে কথাবার্তা চলছে সম্ভব হলে মাঘ মাসেই তাকে পার করা যায় কিনা তার চেষ্টা হচ্ছে। এখন আশ্বিন মাস। সুনীল দশম শ্রেণীর শেষ অঙ্কে। একমাস পরেই টেস্ট পরীক্ষা। পড়াশোনার চাপ সর্বক্ষণ। শান্তা ইদানীং লেখাপড়ায় আর উৎসাহী নয়। নিজেকে

ঢেকেচুকে আড়াল করে চলে। সুনীলের পড়ার ঘরে কখনো এসে একটু দাঁড়ায়। কিছুক্ষণ তার দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। তার বই খাতা নাড়াচাড়া করে। মাঝে মাঝে চঞ্চল দৃষ্টি ফেলে খোলা দরজার দিকে। সুনীলও কোন কথা খুঁজে পায় না। শান্তার মুখের দিকে চেয়ে যে নীরব হাসি ফুটে ওঠে, চোখে যে চঞ্চলতা প্রকাশ পায়, নিঃশ্বাস যে দ্রুততর হয় তার অর্থ তার ইঙ্গিত আর অস্পষ্ট দুর্বোধ্য নয়। শান্তা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে—যাই আমি, তোমার পড়ার ক্ষতি হচ্ছে।

কিছুদিন ধরেই চারপাশে একটা অস্বাভাবিক অস্থিরতা ও আলোড়ন চলছে। সুনীলদের প্রতিবেশীরা একমাত্র ধর্মবিশ্বাস ছাড়া আর সকল বিষয়ে যে একান্ত কাছের মানুষ, আত্মার আত্মীয় সে প্রত্যয়ে কারা যেন বারবার আঘাত হেনে তাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিচ্ছে। মানব ধর্মের চেয়ে গ্রন্থোক্ত ধর্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠনের দাবীতে তারা মাতোয়ারা। একদা নির্জনে পথে চলতে যাদের একজনকে দেখলে নির্ভয় হতো, এখন জনমাঝে তাদের দেখলেও ভয়ে বুক দুরু দুরু করে। কলিকাতা থেকে নানা বীভৎস ও লোমহর্ষক ঘটনার কথা শাখা-প্রশাখায় পল্লবিত হয়ে উত্তপ্ত আবহাওয়াকে আরো এলোমেলো ও উদ্দাম করে তুলেছে। যারা হাটে-বাজারে যায়, তারা সকাল সকাল ফিরে আসে। কেহ বেশীক্ষণ বাড়ীর বাইরে থাকলে তার জন্য দুশ্চিন্তার অন্ত থাকে না; খোঁজাখুঁজি শুরু হয়।

এক ভীতিকর দমবন্ধকারী আশঙ্কা ও আতঙ্কজনক পরিবেশে দুর্গোৎসবের নিরানন্দ দিনগুলি কেটে গেল। কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার দিন আগত। কিন্তু কারোমুখে হাসি নেই। পূজার ফুল-পত্র সংগ্রহে বালক বালিকাদেরও অনাগ্রহ। প্রভাত সূর্য থেকে থেকে মেঘের আড়ালে মুখ ঢেকে রাখে। কখনো কখনো বৃষ্টি ও দমকা হাওয়া। বাতাস দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলে যায় যেন। দূর দূরান্তর থেকে বহু কণ্ঠের জেহাদী জিগীর ভেসে আসে। গায়ের রক্ত হিম হয়ে যায়। আকাশে বাতাসে যেন মৃত্যুর করাল ছায়া ক্রমশঃ ঘনিয়ে আসে। অনভ্যস্ত আবহাওয়ায় সুনীল নির্বাক শান্তা ভয়ে সাদা। দুজনে পড়ার ঘরে চুপচাপ বসে থাকে, কখনো বা ভেসে আসা নিষ্ঠুর কাহিনী নিয়ে নিরুৎসাহ আলোচনা করে।

সেদিন সকাল থেকে নাওয়া খাওয়া নেই কারো। পুরুষদের মুখে অসহায় হতাশা। মেয়েরা চোখের জল মোছে আর তেত্রিশ কোটি দেবতাকে ডেকে গলা ফাটায়, মানত করে। কে কোথা যাবে, কোথা পালাবে, কাকে কোথায় লুকাবে এই ভাবনায় অস্থির। ভয়ে গলা শুকিয়ে কাঠ। বারে বারে জল খাচ্ছে আর একে অন্যকে সাহস জোগাচ্ছে—আরে তোরা ডরাইস্ না, বেদিশা অইছ না। কিচ্ছু অইবো না। কিন্তু তাতে কেহ কোন আশ্বাস খুঁজে পায় না। কারণ স্বয়ং আশ্বাসদাতার কণ্ঠস্বরে নেই দৃঢ়তা। বাড়ীর বাচ্চাকাচ্চাগুলি ভয়ে নির্বাক গলা শুকিয়ে গেছে। বাড়ীতে সবাই সবাইর কাছাকাছি হাটাচলা করে। একাকী ঘরের পেছনে যেতেও কেহ সাহস পায় না। বার বার মাঠের ওপারে রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখে। দূরদূরান্তে নারকেল গাছের বাগান ছাড়িয়ে দেখা যাচ্ছে আগুনের শিখা ধোঁয়ার কুণ্ডলী। রাস্তা দিয়ে দলে দলে লোক হৈ চৈ করতে করতে যাচ্ছে। তাদের হাতে বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র এবং লুঠের মালের অংশ।

সূর্যদেব পশ্চিমাকাশে আবীর ছড়িয়ে বৃক্ষান্তরালে অদৃশ্য হলেন। আকাশে গাঢ় মেঘ ঘনিয়ে আসছে। আর একটি ভয়ঙ্কর রাত কিভাবে কাটবে সে চিন্তায় সবাই অস্থির। এমন সময় হা রে রে করতে করতে এক দল লোক সুনীলদের বাড়ীতে হানা দিল। তাদের হাতে কোচ, টেঁটা, দা, কাটারী, ছেনি, কুড়ুল। তারা ক্ষুব্ধ লুব্ধ উন্মত্ত উত্তেজিত উল্লসিত। বাড়ীর চারপাশে ঘন সুপারী বাগান, আখ ক্ষেত, তারপর ধানক্ষেত। মাঠের মাঝখানে পানের বরজ। বাড়ীর স্ত্রী-পুরুষ সবাই বাচ্চাকাচ্চাদের আঁকড়ে ধরে যে যেদিকে পারল ছিটকে পড়ল। কান্না বন্ধ করতে মায়েরা শিশু সন্তানদের বুকে চেপে ধরে সুপারী বাগানে বা গলাজল ধানক্ষেতে নেমে লুকিয়ে রইলো। মানুষের ভয়ে সাপ জোঁকের ভয় কেটে গেছে তাদের।

সুনীল সুপারী বাগান পেরিয়ে ধানক্ষেতের পাশে গেল। ধানক্ষেত পেরিয়ে মাঠের মাঝে পানের বরজে গিয়ে লুকাবে কিনা ভাবছিল। পেছনে নিজের নাম শুনে থমকে দাঁড়াল। চিনতে অসুবিধা হল না শান্তার কণ্ঠস্বর। সুনীলকে ডাকছে—সুনুদা, আমাকে ধর। সুনীল একবার এদিক-ওদিগ তাকিয়ে ওকে বাঁ হাতে ধরে ডানহাতে ধানগাছ সরাতে সরাতে প্রায় এক গলাজল ধান মাঠ পেরিয়ে পানের বরজে ঢুকে পড়ল। ওরা দুজনেই বাঁশপাতার মতো কাঁপছিল।

কারো মুখ দিয়ে কোন কথা বেরুচ্ছিল না। দীর্ঘশ্বাসের শব্দ কারো কানে গিয়ে পাছে তাদের অবস্থিতি জ্ঞাপন করে দেয় এই ভয়ে তারা শ্বাস চেপে রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করছে। শান্তা মা বাবার কথা বলে হু হু করে কেঁদে ফেলল। সুনীল তাড়াতাড়ি তার মুখে হাত চাপা দিল।

রাত গভীর হয়ে এলো। অসময়ে জলে ভিজে ও আতঙ্কে ওরা দুজনেই শীত শীত অনুভব করছিল। বাড়ীঘর লুটপাট ও ভাঙ চোরের শব্দ তখন প্রায় থেমে গেছে। হঠাৎ সুনীলের মাথায় অভিভাবক সুলভ বুদ্ধি জোগাল। শান্তাকে বলল—আমি একটু সরে যাচ্ছি। তুমি কাপড়টা নিংড়ে ফেল। সুনীল সরে যাওয়ার উপক্রম করতেই শান্তা চাপা কণ্ঠে বলল—ওমা, তুমি যেওনা। আমি একা ভয়ে মরে যাবো।—এই বলে দু হাত বাড়িয়ে সুনীলকে আঁকড়ে ধরলো। সুনীল স্পষ্ট বুঝতে পারল ভয়ে শান্তার বুক ধুকধুক করছে, প্রবল ভাবে ওঠানামা করছে।

কতক্ষণ যে ওরা এভাবে ছিল খেয়াল নেই। আতঙ্কজনিত বিহ্বলতা অনেকটা কেটে গেছে। সুনীল টের পেল শান্তা তার গলা জড়িয়ে ধরে তার মুখটা নিজের দিকে গভীর ভাবে আকর্ষণ করছে। সেই মুহূর্তে তারা নিজেদের মাঝে দুজন ছাড়াও অপর কোন অপরীরি অথচ জাগ্রত তৃতীয় সত্তার সরব অথচ নির্ভয় অস্তিত্ব অনুভব করছিল।

কেশববাবু আর এক মুহূর্ত ওদেশে থাকতে রাজী নন। দেশের মাটি তাদের মায়া কাটিয়েছে এই তার দৃঢ় বিশ্বাস। ধন সম্পত্তি বিনষ্ট হয়েছে, সে ক্ষতি একদিন পূরণ হবে। কিন্তু মানব ধর্মের উপর যে বিশ্বাস, প্রতিবেশীর উপর যে আস্থা হারিয়েছেন তার ক্ষতিপূরণ কি দিয়ে হবে? সুতরাং তিনি নৌকা ডেকে যাত্রার আয়োজন করলেন।

হঠাৎ-প্রাপ্তি ও অচিরাৎ-হারানোর আনন্দ-বেদনায় দুটি কিশোর মনের ওপর দিয়ে যে ঝড় বয়ে গেছে তা বৃহত্তর ঝড়ের তোড়ে চাপা পড়ে গেল। যাবার দিন সকলে চোখের জলে পরস্পরের থেকে বিদায় নিয়ে নৌকায় উঠল। নৌকাঘাটে নারকেল গাছে ঠেস দিয়ে নিষ্পলক সুনীল নৌকার দিকে তাকিয়ে রইল। অর্জুনের শরসন্ধানী চোখে যেমন মৃন্ময় পাখীর চোখ দুটিই ধরা পড়েছিল তেমনি অনেকগুলি মুখের মধ্যে তারই দিকে জলভরা চোখে তাকিয়ে থাকা শান্তার করুণ-কোমল মুখখানাই কেড়ে নিয়েছিল তার সমগ্র দৃষ্টি। ঘাট ছেড়ে মাঠে পড়ে নৌকা শান্তাদের নিয়ে মসজিদবাড়ীর বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

With best compliments from :—

ASIAN MARKETING COMPANY LIMITED

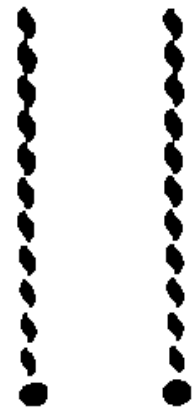

Dealers in

HARDWARE GOODS, ELECTRIC WINTCHES, ETC.

38, Netaji Subhas Road,
Calcutta-1.

With compliments from

WINDOW GLASS LIMITED

15, Brabourn Road, Calcutta-700001.

Reg. Office Phone

B5, Gillander House,
8, Netaji Subhas Road,
Calcutta-700001

Telex : CA 7537 Gram "Winglass" Calcutta

Manufacturer of :

Figured, Wired and Coloured Glass

শ্রীমলিন দত্ত কর্তৃক জগদ্ধাত্রী প্রিন্টার্স, ৫৯/২ পটুয়াটোলা লেন, কলি-৯ থেকে মুদ্রিত ও ৩০/১এ, কলেজ রো, কলি-৯ থেকে প্রকাশিত। Rs. 2·00